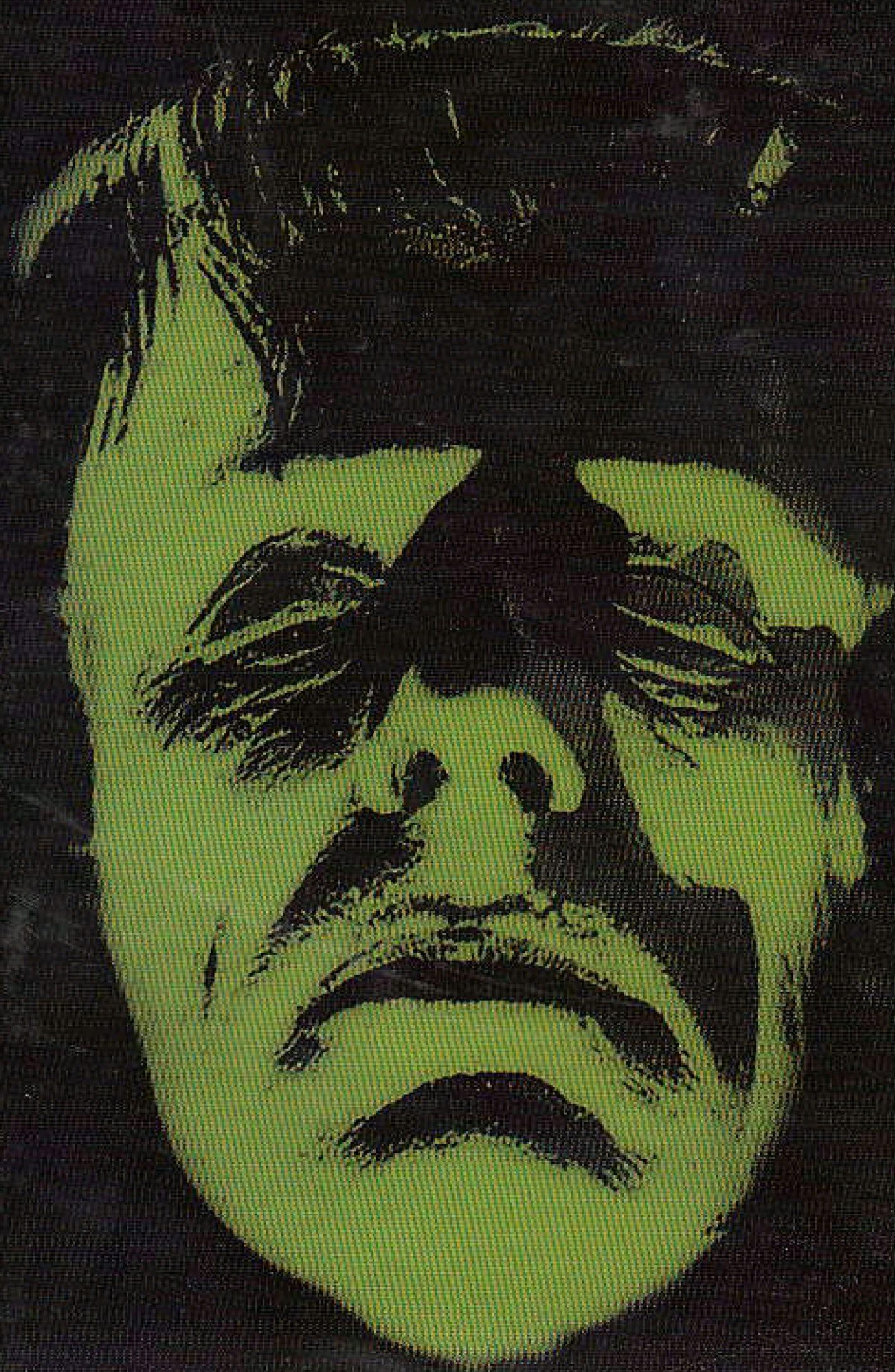
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

মেরি শেলি



চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

মেরি শেলি

অনুবাদ
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়


বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৫১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১২ ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১২ ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪২০ নভেম্বর ২০১৩



প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
নব্বই টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0250-3

FRANKENSTEIN by Mary Shelley :Translated into Bengali : by Sunil Kumar Gangopadhaya
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000 Bangladesh.
Cover Design : Dhrubo Esh, First Edition December 2005. Price Tk. 90 Only.

উৎসর্গ

কুঙ্কুম
বাদশা
পাপড়ি
ডিউক-কে



মেরি শেলি (১৭৯৭-১৮৫১)

ভূমিকা

কবি-পত্নী মিসেস মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট শেলির রচনা এই প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই বইটির চিত্ররূপ সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট সাড়া এনেছিল। মূল কাহিনী এবং চিত্ররূপ—এই দুইয়ের থেকে বেছে নিয়ে ছোটদের জন্য কাহিনীটি আমার লিখতে হয়েছে। তাই অনেকক্ষেত্রেই মূল কাহিনী কিংবা চিত্ররূপ যে অনুসৃত হয়নি, তা বলা বাহুল্য।

উইলিয়ম গডউইনের মেয়ে মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট লন্ডন শহরে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে কবি শেলি প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুকের মৃত্যুর পর মেরি শেলিকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম বই 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আরো কতগুলো প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে : 'ভ্যালপার্গা' (১৮২৩), 'দি লাস্ট ম্যান' (১৮২৬), 'ফর্চুন্‌স্‌ অব পার্কিন ওয়ারবেক' (১৮৩০) এবং 'লোডোর' (১৮৩৫)। শেলির মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইটালিতেই ছিলেন, কিন্তু পরে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। মিসেস শেলি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে মারা যান।

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' লিখতে তিনি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার চমকপ্রদ বিবরণ মিসেস শেলি ডায়েরিতে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে লিখে গেছেন। এক সূর্যকরোজ্জ্বল সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি, শেলি এবং কবি বায়রন জেনেভাতে মহানন্দে আছেন, এমন সময় ফরাসি ভাষায় অনূদিত কতগুলো জার্মান ভুতুড়ে গল্প তাঁদের হাতে পড়ে। ওই দুঃসহ কাল্পনিক গল্পগুলো পড়ার পর বায়রন আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন : 'আমরাও প্রত্যেকেই এক-একটি ভূতের গল্প লিখব।' তিনজনেই সম্মত হয়ে লিখতে শুরু করেন, কিন্তু একমাত্র মিসেস শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' ছাড়া আর দুজনের লেখা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল। সঠিক জানা যায়নি যে বায়রন এবং শেলি ভূতের গল্প লিখেছিলেন কি না!

১৩৪৮-এর কার্তিক মাস থেকে এই 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' 'মাসপয়লা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কুলজা সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী এবং মাসপয়লা ও রবিবারের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩৫২ সালে।

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক

শেষরাত্রের অভিযান

হিমশৈলের শীত-মন্থর আকাশে বাতাসে কেঁপে কেঁপে বাজল চারটে। শীতের শেষরাতে তখনো কেউ জেগে ওঠেনি, তখনো প্রতি গৃহের দ্বার রুদ্ধ। পাখিরা তখনো তাদের বাসায় শীতের শেষরাতের বাতাসের অলস ভাবটুকু পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছিল।

কালো গরম পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা দুটি লোক খ্রিস্টিয়ানদের সমাধিক্ষেত্রের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে, সঙ্গে তাদের কোদাল ও শাবল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবু তারা একবার সমাধিক্ষেত্রের দিকে ভালো করে তাকাল।

কিছু কি দেখা যায়? এই নিরন্ধ্র অন্ধকার, এই জমাট কুয়াশার আবরণ—চোখের দৃষ্টি অল্প একটু পথ অগ্রসর হয়েই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু তারা শুনেছে, আজই তাদের জীবনের পরম শুভমুহূর্ত আসবে। জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা। আজই তাদের কাজ করা চাই। আজই...আজই....

শুধু পথ চেয়ে অপেক্ষা, রাত্রির অন্ধকারে গোপনে নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। ঐ যে দেখা যায় দূরে কয়েকজন লোক—আবছায়ার মতো—স্পষ্ট করে দেখা যায় না কিছুই, তবু—তবু তারাই হয়তো হবে। আর তবে দেরি করা চলবে না।

সেই লোকদুটি কোদাল ও শাবল মাটিতে ফেলে নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ল সমাধিক্ষেত্রে। তারপর আস্তে আস্তে সেই লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। চোখে তাদের হর্ষ, উদ্বেগ, ভয়।

কিছুদূরে কতগুলো লোক কবর খুঁড়ছিল। সেই লোকদুটি তাদের কাছাকাছি এসে থেমে একটু ভালোমতো জায়গা দেখে লুকিয়ে পড়ল। উদ্বেগে তাদের বুক ধুক্‌ধুক্‌ করছে।

প্রতি মুহূর্ত তাদের কাছে যুগ যুগ বলে মনে হচ্ছিল। এই প্রতীক্ষার কি শেষ নেই? শেষ নেই এই অনিশ্চিত সংশয়ের? এই কবর দেওয়া কি শেষ হবে না? এরা তাড়াতাড়ি হাত চালায় না কেন? এই শীতের মাঝে ওরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে যাক, তারা নামুক তাদের কর্মক্ষেত্রে। শেষ হোক এই দীর্ঘ উদ্বেগময় প্রতীক্ষা, শুরু হোক নতুন জীবনের ছন্দময় চাঞ্চল্য।

যাক—শেষ হল তাদের কবর দেওয়া। সেই লোকদুটির এল কর্মক্ষেত্রে নামার সময়। শীতের বাতাস হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এখন চলছে উপাসনা : মৃতের আত্মা সুখে থাকুক। সে এ জন্মে যদি কোনো পাপ করে থাকে, মুছে যাক তা—সে নতুন আলোর সন্ধান পাক!

উপাসনা শেষ হলে সকলে উঠে দাঁড়াল। এবারে ফিরতি-পথ। দুঃখে, কষ্টে, শ্রান্তিতে প্রত্যেকের শরীর ভেঙে আসছে। তারা চলে গেল নিচুমুখে—নিঃশব্দে। শীতের তুহিন বাতাসের মাঝ দিয়ে দূর হতে ভেসে আসছিল তাদের সকলের সম্মিলিত জুতোর শব্দ : মচ্—মচ্।

লোকদুটি এবার তাদের গুপ্তস্থান হতে বেরিয়ে পড়ল। একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তারা বাঁচল। সেই শীতের মধ্যেও মানসিক উত্তেজনায় তাদের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে। আঙুল দিয়ে সেগুলো তারা মাটিতে ছিটিয়ে দিল।

তখন একজন বললেন—ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, এবারে আমরা তবে আমাদের কাজ আরম্ভ করি। এর পরে বড্ড বেশি বেলা হয়ে যাবে, পথে লোক চলাচল শুরু হয়ে যাবে। তখন ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, এখনই হাত চালানো উচিত।

তাঁরা দুজনে শাবল কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন।

এক অজানা আতঙ্ক, এক গা-ছমছম ভয়, শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে তুষার-শীতল হিমপ্রবাহ—তাঁদের সমস্ত শরীরকে যেন অসাড় করে ফেলছিল। এই গোপন শব-সন্ধান বা শব-শিকার মানুষের চোখে কত ঘৃণ্য, কত পাপ! বিবেক বাধা দেয়, কিন্তু তাঁরা নিরুপায়! বিজ্ঞান-সাধনার দুরন্ত আহ্বান তাঁদের এই অসামাজিক কাজে বাধ্য করেছে।

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, উঁচু-করা মাটির ঢিপির উপর একটা ক্রুশচিহ্ন, কিছু ফুল—তার সুরভি সে জায়গাকে ঘিরে রয়েছে। আর চারদিক নির্জন, তখনো দু-একটা তারা আকাশের শেষ কোণে বসে অবাক হয়ে পৃথিবীর একপ্রান্তে তাদের দিকে চঞ্চল-চোখে তাকিয়ে রয়েছে; বোবা নীল আকাশ যেন ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ নির্জন সমাধিক্ষেত্র অসহ-বিস্ময়ে এই দুটি অবাঞ্ছিত মানুষের সমস্ত কাজ লক্ষ করে চলেছে যেন যখন-তখন অট্টহাসি হেসে উঠতে পারে। দু-একটা গাছের শাখা কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে, তার শব্দও সেখানে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এই নিরাত্ম্য অশরীরীদের বাসস্থানের রহস্যময় আবহাওয়াতে দুজনেই একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—নীল, এবার হাত চালান। কিন্তু খুব সাবধান! মৃতদেহের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। কোথাও যেন তার আঘাত না লাগে।



তাঁরা দুজনে খুব তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। উত্তেজনায় সারা শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, কপালে জমে উঠছিল ঘাম। চোখের পাতা পড়ছে না, শুধু হাত চালাও, হাত চালাও। আর সময় নেই।

পাখিরা দু-একটি যেন কোথায় ডেকে উঠল। তবে কি আজ আর এই মৃতদেহের উদ্ধারের কোনো আশা নেই? তবে কি তাঁদের এই এতদিনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে? তবে কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় কেউ জানতে পারবে না—দেখতে পারবে না? মানুষ যে মানুষের চেয়েও বড়, তার শক্তির যে সীমা নেই—এ প্রমাণ কি জগৎ কোনোদিন পাবে না?

নীল বললেন—অসম্ভব, এতখানি খোঁড়া অসম্ভব। এরা কত খুঁড়ে কবর দিয়েছে!

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—ওদের দোষ কোথায়? এই সমাধিক্ষেত্র থেকে কিছুদিন আগেই আরো কয়েকটা মৃতদেহ চুরি যাওয়াতেই তাদের এই সাবধানতা! সেই শব-শিকারি যে কে—আমার আর আপনার চেয়ে কে আর তাদের ভালো করে জানে?

কিন্তু ঠক্ করে শাবল যেন কিসের উপর লাগল। তাঁরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। তবে কি শবাধারে শাবলটা লেগে গেছে? তাঁরা দুজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন : মুখে বিজয়ের হাসি, চোখে সাফল্যের জ্যোতি, বুকে জয়গৌরবের উৎকণ্ঠা।

কিন্তু সেটা প্রকাণ্ড এক পাথর। হতাশায় মন ভেঙে গেল। এতক্ষণ অমানুষিক পরিশ্রমের ফল কি সামান্য এক পাথরের জন্য? তাঁদের আর গর্ত খুঁড়বার সামর্থ্য রইল না, তাঁরা দুজনেই গভীর হতাশায় বসে পড়লেন। এই শীতের মাঝে রাত্রের নিদ্রাত্যাগ করে মিথ্যা এ পণ্ডশ্রম!

কিন্তু বসে থাকলে চলবে না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাঁদের পরীক্ষার মাঝে কত বাধা এসেছে—তবু তো তাঁরা কখনো ম্রিয়মাণ হননি। কখনো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েননি। আজ এতদূর গর্ত খুঁড়ে মাত্র অল্প একটুর জন্য তাঁদের আজীবন সাধনা সফল হবে না? জগৎ কি জানবে না যে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কী বিস্ময়কর অধ্যায় পৃথিবীর বুকে এনে দিলেন!

তাঁরা দুজনে আবার নতুন উদ্যমে গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। পাথর গেল গুঁড়ো হয়ে, মাটি চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর দেরি নেই, আর দেরি নেই...

শবাধারটা তাঁরা দুজনে টেনে তুললেন। এখনো নতুন রয়েছে, কোথাও আঁচড় লাগেনি।

কিন্তু ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে। এই সময়ে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে শব চুরি করে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যখন-তখন ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তারপর কানাকানি, কৈফিয়ত, হাঙ্গামা—

নীল বললেন—আর গর্ত বন্ধ করতে হবে না। দেরি হয়ে যাবে, কেউ দেখেও ফেলতে পারে। এখন পালানোর চেষ্টা করা দরকার। একবার গিয়ে ল্যাবরেটরিতে উঠতে পারলে হয়! তারপর—

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—কিন্তু যাব কী করে? সকাল হয়ে এল যে! কুয়াশা এখনো কাটেনি বটে, কিন্তু লোকের চোখে বামালসুদ্ধ ধরা পড়ে যাব।

নীল বললেন—এক উপায় আছে। অনেক ঘুরে যেতে হবে। উঁচু পাহাড়টার উপর দিয়ে ঘুরে পিছন দিক দিয়ে ল্যাবরেটরিতে গেলে কেউ দেখতে পাবে না।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—এ ছাড়া আর উপায় কী! তাই চলুন।

তাঁরা দুজনে শবাধারটিকে কাঁধে করে এগোতে লাগলেন। পাঁচিলের কাছে এসে তার উপর শবাধারটাকে তুলে দিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন। কিন্তু শবাধারটি পাঁচিলের উপর ঠিক হয়ে থাকতে পারল না। এপাশ-ওপাশ নড়তে লাগল। তাঁরা শবাধারটিকে ভালো করে ধরার আগেই সেটা ওদিকে উলটে পড়ে গেল, দুজনে চিৎকার করে উঠেই পাঁচিল টপকিয়ে ওপাশে লাফিয়ে পড়লেন। উঁচু থেকে পড়ে শবাধারের দু-এক জায়গায় চোট লেগেছে।

আবার শবাধারটিকে তাঁরা তুলে নিলেন। কে জানে ভিতরে মৃতদেহের কী হয়েছে?—কোনো ক্ষতি হয়েছে কি-না! মনে একটা খটকা লেগে রইল, অস্বস্তিকর এক সংশয়।—তাঁদের আর উঁচু পাহাড়টার উপর দিয়ে যাওয়ার সাহস হল না।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—সোজা রাস্তা দিয়েই যাব। যা হবার হবে।

শবাধারটিকে কাঁধে করে তাঁরা সোজা রাস্তা দিয়েই চললেন।—তবে কুয়াশা কেটে যাবে শিগ্‌গির।

পথে আর বাধা নেই। এখনো সমস্ত দেশ নিদ্রামগ্ন, এখনো সুষুপ্তি, এখনো সুখ-শয্যা! বেঁচে থাকো তোমরা, এদিকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় পূর্ণত্ব লাভ করুক। সফল হোক এক বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী নিরলস সাধনা, সফল হোক বিশ্বমানবের একক কল্যাণপ্রচেষ্টা।

যাক্—ল্যাবরেটরি ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

দুই

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

মধ্য-ইউরোপের তুষার-শৈলে ঘেরা শহরটি। ছোট্ট শহর, তার চেয়ে কম লোকজন। যেদিকে তবু জনমানবের বসতি আছে সেই দিকেই বাজার, সেই দিকেই হোটেল, খেলার মাঠ, সমাধিক্ষেত্র। দুরন্ত শীতে তার সব জায়গাই বরফে জমাট বেঁধে থাকে সব সময়ে।

একটু দূরে যেখানে মানুষের চলাচল প্রায় শেষ হয়েছে, যেখানে পর্বতশৃঙ্গ আরো উদ্যত হয়ে আকাশের উচ্চতা মাপবার জন্য প্রতিযোগিতা করছে—তারই একটি পাহাড়ের উপরে উঁচু-উঁচু পাইন চেরির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অপরিসর একটি পায়েচলা পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে অনেকটা উপরে। সেইখানে দেখা যায় সুন্দর একটা বাড়ি।

ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ল্যাবরেটরি।

ডক্টর ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তাঁর বসবার ঘরে নির্জীব পঙ্গুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতে একটি চিঠি—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সেই চিঠির ওপরে নেই, জানলার বাইরে কুয়াশার ভিতর দিয়ে দূরের অস্বচ্ছ তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণীর ওপর যেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। চোখের কোণে ছোট্ট মুক্তোর মতো একফোঁটা জল যেন জমে আছে, ঝরে পড়তে পারছে না। পাছে সেই বেদনার্ত সময়ের সমাধি ভঙ্গ করে ফেলে।

এই নিথর নিস্পন্দ মূর্তির দিকে এখন তাকালে মনে হবে না যে ইনি সেই ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন—যিনি আজ পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, যাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সজীব চঞ্চলতায় পরিপূর্ণ, কাজ—কাজ—কাজ ছাড়া আর যাঁর অভিধানে কোনো শব্দ ছিল না।

সেই বিমর্ষ বিধুরতা যেন একটু নাড়া পেল, ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বুক থেকে অস্ফুট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে সমস্ত ঘরকে যেন প্রবলভাবে নাড়া দিল। হাতের চিঠিটা আর একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, চিঠির কয়েকটি লাইন তাঁর চোখে ভেসে উঠতে লাগল। চিঠির শেষটুকু তিনি আর একবার দেখলেন :

> যাই হোক্‌, তুমি বিশেষ চিন্তা কোরো না। তোমার কাজ যতদূর শীঘ্র শেষ করে একবার অন্তত আমাদের দেখা দিয়ে যাও। যদিও আজ বাড়ির সকলে অত্যন্ত গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন, যদিও ভগবান ছাড়া আর কারো কাছ থেকে এই বেদনায় সান্ত্বনার

আশা করা যায় না, তবুও মনে হয় তুমি এলে বাড়ির চেহারা একটু বদলে যেতে পারে। ইতি। তোমার বাবা আলফোন্স ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

বাবার কথা মনে পড়ে যায় ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের। সেই জেনেভার শহরতলিতে সুন্দর ছোট বাড়ি, ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো—প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে তাঁকে ইঙ্গলস্টাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আর তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য এই ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেওয়া।—প্রতিদানে তিনি বাবাকে কী দিতে পেরেছেন! কতদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় না, কতদিন মা'র—

মা'র কথা মনে পড়তেই আবার চিঠির দিকে তাকালেন, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল :

আজ প্রায় পাঁচ বছর হল তোমার দেখা পাইনি। শুনে দুঃখিত হবে যে তোমার মা আজ সাতদিন স্কারলেট ফিভারে ভুগে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নিজে থেকেই বললেন—না থাক, তার কাজের অসুবিধা হবে।

তোমার ছোট দুই ভাই আর্নেস্ট আর উইলিয়মের খুব কষ্ট হয়েছে। বয়সে তো তারা তোমার থেকে অনেক ছোট। এলিজাবেথ যদিও প্রথমে ভেঙে পড়েছিল, তবু তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে শক্ত হয়েছে। সে আর আমাদের বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকা জাস্টিন সকলের দেখাশুনা করছে। তোমার মা'র বড় ইচ্ছা ছিল, এলিজাবেথের সঙ্গে তোমার বিয়ে তিনি দেখে যাবেন।

মা—মা নেই। দিনের সূর্যকে যেন একনিমেষে নিবিড় কালো মেঘ ঢেকে ফেলল, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নিরন্ধ্র অন্ধকার, জমাট কুয়াশাভরা আকাশে যেন অমানিশার দুঃস্বপ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে! মা নেই—ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মা নেই! এক অসীম শূন্যতা, এক নিঃসঙ্গ অসহায়তা ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কত বছর মাকে তিনি দেখেননি? পাঁচ বছর—তা হবে। মাকে তিনি এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ভুলে ছিলেন, কিন্তু মা তাকে ভোলেননি। তাঁর কাজের অসুবিধা হবে বলে মৃত্যুর সময়েও মা তাঁকে দেখতে চাননি। মা, সোনামণি মা!

চোখের সামনে থেকে কুয়াশা যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। অন্ধকার ভেদ করে একফালি সোনালি রোদ নিঃসঙ্গ হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টি করল। মনে পড়ল ছোট্ট দুটি ভাই আর্নেস্ট আর উইলিয়মের কথা। দাদাকে তারা কত ভালোবাসে! দাদা তাদের বড় বৈজ্ঞানিক—এই গর্বে তারা বুক ফুলিয়ে হাঁটে। আর এলিজাবেথ! মা'র পালিতা কন্যা। একটার পর আর একটা ছোট ছোট ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ছায়াছবির মতো এসে সরে যেতে লাগল।

আমাদের এই দুঃখ ও বিপদের দিনে প্রভূত সাহায্য করেছে তোমার বন্ধু ক্লেরভাল। তোমার মা'র সেবা-শুশ্রূষা থেকে শুরু করে শেষ কাজ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন সে করেছে। তার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। আজও সে সমানে আমাদের দেখাশোনা করে।

হেনরি ক্লেরভাল! ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের আজন্ম সুহৃদ ও সহপাঠী। বিজ্ঞান পড়ার ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও তার বাবা তাকে পড়তে দেননি, পারিবারিক ব্যবসায়ে প্রথম থেকেই ঢুকিয়ে দেন। ক্লেরভাল দেখাশোনা করছে—এই যা ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সান্ত্বনা।

ডক্টর নীল এসে ঘরে ঢুকে একটু ভীত হয়ে উঠলেন। তাঁর গুরু ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের চেহারার এ কী পরিবর্তন! আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে তিনি তাঁর সঙ্গে একত্র কাজ করছেন—প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ ও সদাহাস্যময় এই ব্যক্তিকে কখনো এত অসুস্থ, এত উদ্যমবিহীন দেখেননি। বললেন—স্যার! আপনার কি অসুখ করেছে?

না—ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উত্তর দিলেন—মা মারা গেছেন, চিঠি এসেছে।

—আপনার তো তবে একবার বাড়ি যাওয়ার দরকার।

বাড়ি!—একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—হ্যাঁ, যাব। তবে আগে কাজ! মা মৃত্যুর আগে আমাকে দেখতে চাননি—আমার কাজের অসুবিধা হবে বলে। মা-র এতবড় অসুখ—আমাকে কেউ আগে খবর দেয়নি ডক্টর নীল—আমার কাজের অসুবিধা হবে বলে। ডক্টর নীল, কাজ—কাজ—কাজ! আমার আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যে কাজ শুরু করেছি, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতেই হবে। আজ কাজ ফেলে চলে যাব?

ডক্টর নীল বললেন—তা ঠিক। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—আপনি ঠিক কী কাজ করছেন—মানে—আপনি ঠিক কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, আমি আপনার সঙ্গে এতদিন থেকেও ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—আমি যে কী করছি তা আমি কাউকে বলিনি। আপনি আমাকে এত সাহায্য করছেন, তবু আমি আপনার কাছে সেকথা গোপন করে রেখে গেছি। হয়তো আপনি আমাকে অনেক কিছু ভাবতে পারেন—বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত অন্তর একসঙ্গে সব কথা আপনাকে অনেকবার বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি—শুধু আপনি হাসবেন বলে। কারণ আমি জানি, আমি অসম্ভবের কল্পনা করছি—অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধনা করছি। এই সাধনার জন্য সুদীর্ঘ পাঁচ বছর আমি ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করে এই নির্জন নির্বান্ধব দেশে ল্যাবরেটরিতে আপনাদের দু-একজনকে নিয়ে পড়ে আছি। কতবার বাবা-মা'র কাছ থেকে চিঠি এসেছে, উত্তর দেওয়ার পর্যন্ত সময় হয়নি। আমার প্রাণের বন্ধু হেনরি ক্লেরভাল কতবার ছুটে এসেছে জেনেভা থেকে আমার খবর নিতে। কতবার সে জিজ্ঞাসা করেছে—কী আমার গবেষণার বিষয় যার জন্য আমি সব ভুলে বসে আছি? তার কাছে আমার কোনো কথা গোপন নেই, কিন্তু—কিন্তু তাকেও আমার গবেষণার বিষয় বলতে পারিনি। সে বিশ্বাস করবে না, উপহাস করবে—এই ভয়ে। আপনি বৈজ্ঞানিক, আমার সহকর্মী এবং এই গবেষণার চরম সাফল্যে আপনার দানও কম নয়—এই স্বীকৃতির জন্য আজ আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলব। হয়তো বিশ্বাস হবে না, মনে মনে হাসবেন—তবু কাউকে আমার কথা না বলে পারছি না। কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে যে, একথা আর কাউকে আপনি এখন জানাবেন না।

ডক্টর নীল বললেন—আপনি আমাকে সহকর্মী বলে বেশি সম্মান দিচ্ছেন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার নগণ্য এক সহকারী মাত্র। আপনাকে অবিশ্বাস করলে এতদিন আপনার কাছে পড়ে থাকতাম না। আপনি আমাকে সব কথা নির্ভয়ে বলতে পারেন; আমার কাছ থেকে কোনো কথা প্রকাশ পাবে না।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—ছেলেবেলা থেকে আমার কলকজা এবং বিজ্ঞানের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক। অবাক হয়ে দেখতাম কেমন দম দিলে রেলগাড়ি ছুটে চলে, ছোট পুতুল প্রভৃতি নাচে। দিন দিন বিজ্ঞানের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে লাগল। তারপর যখন বড় হলাম, তখন এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল—কলকজা দিয়ে যদি পুতুল চালানো সম্ভব হয়, মানুষ গড়া কি অসম্ভব হবে? মানুষ যদি মানুষের প্রাণ নিতে পারে, তবে চেষ্টা করলে কি প্রাণ দিতে পারে না? দিনরাত শুধু ভাবতাম, কী করে মানুষ তৈরি করব।

শুধু সেইজন্যই বাবার শত অমতে, বন্ধু ক্লেরভালের নিষেধ সত্ত্বেও মা'র চোখের জল অগ্রাহ্য করে ইঙ্গলস্টাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়তে গেলাম। আমার অধ্যাপকদের মধ্যে দুজন— প্রফেসর ক্রেম্প আর প্রফেসর ওয়াল্ডমান—ঠিক আমার মতোই অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন। তাঁদের দুজনের কাছে আমি শুনতাম অ্যালকেমির যুগের অসাধ্যসাধনের প্রচেষ্টার কাহিনী, কত অলৌকিক ঘটনা—সে যুগের বিজ্ঞান যার কারণ দেখাতে পারেনি, অথচ অনেক বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে প্রফেসর ওয়াল্ডমান আমার এই পাগলামির প্রধান সহায়ক হয়ে উঠলেন। পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল, বাড়িতে ফিরে গেলাম—কিন্তু মাথায় সেই একই চিন্তা—কী করে মৃতে জীবন সঞ্চার করা যায়, কী করে নতুন মানুষ সৃষ্টি করা যায়—যে মানুষ জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, কর্মশক্তিতে সাধারণ মানুষের চেয়েও বড় হবে। যাকে দিয়ে নতুন এক সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করা যাবে।...

তিনি বলে যেতে লাগলেন—এইজন্য কত বই পড়তে শুরু করলাম। কত জাদুকরের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তারপর নিজে কিছু কিছু জাদুবিদ্যা শিখতেও শুরু করলাম। মনে মনে অসম্ভব বল পেলাম। জাদুবিদ্যা এবং বিজ্ঞান এই দুই বিদ্যার সাহায্যে যে আমি মানুষ গড়তে পারব—সে বিষয়ে আমি একরকম নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম আমার প্রাণের বন্ধু ক্লেরভালের সাহায্য নেব, কারণ একা একা সব করা সম্ভব নয়, কিন্তু ও পাগল ছেলে, ওর ধৈর্য নেই। তাই কী যে করব বুঝে উঠতে পারলাম না। কাজটা আমি গোপনভাবেই করতে চাই; তাই শবদেহ সংগ্রহও গোপনে করাই উচিত। কিন্তু একা যে-কী করে সম্ভব ভেবে উঠতে পারলাম না। এমন সময় আপনার সঙ্গে আলাপ। অর্থাভাবে আপনি বিজ্ঞানচর্চায় মন দিতে পারছিলেন না, সে অর্থাভাব আমি দূর করলাম—একটি শর্তে যে, আপনি বিনা-প্রতিবাদে আমার কথা শুনবেন। আজ পর্যন্ত আপনি আপনার শর্ত সম্পূর্ণ মেনে চলেছেন, যার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তারপর আপনি শবদেহ সংগ্রহ করে আমার যে উপকার করেছেন, তা আমি জীবনে ভুলব না।

ডক্টর নীল বললেন—কিন্তু, মানুষ গড়া কি সত্যিই সম্ভব?

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—নয় কেন? আমার সব কাজ শেষ হয়ে এসেছে। শুধু আপনি আজ আর একটা কাজ করে দিন! আপনি সায়েন্স ইনস্টিটিউট থেকে শুধু একটি মানুষের 'ব্রেন' এনে দিন। অত্যন্ত গোপনে এবং লুকিয়ে আনতে হবে। তারপর আশা করি, এ ব্যাপারে আর আপনার দরকার হবে না।

ডক্টর নীল বললেন—বেশ, আজই আপনি তা পাবেন।

সায়েন্স ইনস্টিটিউট। ডক্টর রে উৎসুক ছাত্রদের বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। ডক্টর নীল ছাত্রদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জারে 'ব্রেন'গুলো রয়েছে অ্যালকহলের মধ্যে। ডক্টর নীলের গা ছম্ ছম্ করে উঠল। আজই বক্তৃতার পর ওরই একটি চুরি করতে হবে। যদি ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের আবিষ্কার সফল হয়... যদি তিনি মানুষ গড়তে পারেন... যদি অতিমানুষ মানুষের হাতে বন্দি হয়, যখন ইচ্ছা তাকে মারো, যখন ইচ্ছা বাঁচাও...তবে...তবে...? সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়বে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নাম—আর তার এককোণে ছোট্ট তারার মতো জ্বলবে তাঁরও নাম। জগতের মনীষীদের মাঝে তাঁদের নাম থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে—এঁরা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এঁরা মানুষকে অজেয় করেছেন, এঁরা মানুষকে শক্তিমান করেছেন!

ডক্টর নীল লুব্ধদৃষ্টিতে অ্যালকহলে-রাখা ব্রেনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। ডক্টর রে যে কী বলছেন তা তাঁর কানে যাচ্ছিল না। তিনি শুধু প্রতীক্ষা করছেন, কখন এই অভিনয়ের শেষ হবে—কখন শেষ হবে বক্তৃতা—কখন রঙ্গমঞ্চে নামবার আসবে লগ্ন!

ঢং ঢং ঢং....

ঘণ্টা বেজে গেল। বক্তৃতার সময় শেষ হয়েছে, এসেছে তাঁর রঙ্গমঞ্চে নামবার চরম মুহূর্ত। চোখের সামনে নাচছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জারগুলো। এক মুহূর্ত—শুধু এক মুহূর্তের জন্য চাই সময়! তারপর নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখের পথে—বাধা নেই, বিঘ্ন নেই—আছে শুধু ছন্দ-হিল্লোলিত জীবনের আলোকিত পথ—আছে জীবনের গৌরবময় সাফল্য।

ডক্টর রে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরাও চলে গেল ক্লাস থেকে। ডক্টর নীল এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ক্লাসটি নির্জন হতেই ছুটে গেলেন তিনি। কোন্‌টা নেবেন ভাববার সময় পেলেন না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই। কে কখন এসে পড়বে, কে কখন দেখে ফেলবে—তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা নিমেষে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা জার থেকে একটা ব্রেন নিয়ে গোপনে বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে।

যাক্, এখন তিনি নিশ্চিন্ত। এখন আর ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি বেরিয়ে যেতে পেরেছেন।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ব্রেনটা দেখে একটু চমকিয়ে উঠলেন—এ কি মানুষের ব্রেন! কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। পাঁচ বছর প্রায় কেটে গেছে এই মানুষটি গড়তে—আর অপেক্ষা করতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। অতিমানুষই তো তিনি সৃষ্টি করতে চলেছেন, তবে মিছে এ ভয় কেন? আর যদি মানুষ গড়তে গিয়ে অমানুষ হয়ে যায়—তবে প্রাণ যখন দিয়েছেন, নিতেও পারবেন। যদি এ মানুষ না হয়, তবে এর প্রাণ নিয়ে আর একটি মানুষকে প্রাণ দেবেন। সে-ও যদি মানুষ না হয়, তবে দেবেন আর একজনকে। প্রাণদানের রহস্য যখন তিনি উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন তখন আর ভয় কী? তাঁর সাধনা সফল করে তারপর তিনি নেবেন ছুটি।

নভেম্বরের মৃত্যু-শীতল অন্ধকার নিশ্ছিদ্র রাত্রি। সমস্ত শহরটায় একটি প্রলয়-লীলা চলছে। কাছের বড় বড় গাছ কাঁপিয়ে শীতের ঝড়ো বাতাস হা-হা করে দরজা-জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা মোটা কাচের সার্শির ওপর মাথা খুঁড়ছে। দূরের কাছের সমস্ত পর্বতশৃঙ্গে সাদা জমাট বরফের ওপর দীর্ঘ শীতল রাত্রি জমে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সামনে টেবিলের উপর শুয়ে রয়েছে একটি সুন্দর অতিমানুষ। কী সুন্দর তাকে দেখতে—কী সুন্দর তার মুদিত চোখ, কী সুন্দর তার নির্বাক মুখ, আর কী সুঠাম তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!

ওই সুন্দর মানুষটির দিকে তাকিয়ে ভাবছেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। এখন আর বাকি শুধু প্রাণপ্রতিষ্ঠা। হয় মানুষ জিতবে, নয় ভগবান। আজ ভগবানের পরাজয় মানুষের হাতে প্রতিমুহূর্তে। শুধু এই মানুষ মরা-বাঁচার ব্যাপারেই এখনো তিনি অপরাজেয় হয়ে আছেন। যদি এই সাধনায় আজ তিনি জয়যুক্ত হন, তবে পৃথিবীতে দেবত্বের অবসান—মানবের জয়জয়কার। মানুষের এই বিজয়, মানবসমাজের যে কতখানি মঙ্গল করবে এই ভেবে দেবতার নিজে থেকে পরাজয় স্বীকার করা উচিত।

সুদীর্ঘ রাতও ছোট হয়ে আসে। মোমবাতিটি গলে গলে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই মূর্তিটির দিকে। কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কখন জাগবে মানুষ—তাঁর সৃষ্টি এই অতিমানুষ।

তিন

অদ্ভুত এক সৃষ্টি

সমস্ত দেহটা যেন হঠাৎ একসময়ে কেঁপে উঠল। চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে! তবে কি মড়া বাঁচল? তাঁর সাধনা কি সফল হল?

না, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। চোখ দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না সে জীবিত না মৃত। তিনি অধীর আগ্রহে সেই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাতটা একবার যেন নড়ে উঠল। পরক্ষণেই মৃতদেহটি তার হাত তুলতে চেষ্টা করল। হাতটি কিছুদূর উঠে আবার পড়ে গেল!

তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন! যুগ যুগ ধরে সমগ্র মানবের যে কামনা ছিল—মানুষের প্রাণদান—তাই আজ তিনি সফল করেছেন। মড়া বেঁচেছে!!!

চোখদুটো কিন্তু এখনো তেমন পীতাভ, তেমন স্থির, জ্যোতিহীন, নিষ্প্রভ। হাত-পা—সবই অসাড়। যেন যোগাবিষ্ট হয়ে শুয়ে আছেন এক মহামানব। আর কত সময় লাগবে? বাঁচবে কখন, জাগবে কখন তাঁর সৃষ্ট এই মানুষ?

গাঁ গাঁ গাঁ...

গাঁ গাঁ গাঁ...

অস্ফুট এক শব্দে তিনি চমকে ওঠেন। সেই মড়াটির গলার ভিতর ঘড় ঘড় করে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে তার হাত নড়ে উঠল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তাঁর হাত এগিয়ে দিলেন তার দিকে। সে তার দুটি আঙুল দিয়ে সজোরে ধরল তাঁর হাত। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় হাত ছাড়িয়ে নিলেন। হাতে তাঁর কালশিরা পড়ে গেছে। কী অমানুষিক শক্তি তার হাতে! এত শক্তি তিনি তার দেহে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন?

একবার তাঁর ভয় হল—যে এখনো ভালোভাবে বাঁচেনি, তারই যখন এত শক্তি যে সামান্য দুটি আঙুলের জোরে সে তাঁর হাতে কালশিরা ফেলে দিতে পারে—সে যখন বাঁচবে তখন সে তো অজেয় হয়ে উঠে যেখানে-সেখানে যা-খুশি তাই করে বেড়াবে, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না—এমনকি নরহত্যাও করে বেড়াতে পারবে।

কিন্তু তারপর মনে হল: শক্তি তার হবেই, কিন্তু সে বেঁচে উঠলে মানুষই হবে—তার শক্তির অপপ্রয়োগ সে তো না করতেও পারে। তাঁর সাধনাও তো এক শক্তিশালী অতিমানুষ তৈরি করা!

গাঁ গাঁ গাঁ...

গাঁ গাঁ গাঁ...

তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকিয়ে ওঠেন তিনি। টেবিলের উপর শুয়ে শুয়ে সেই মড়াটি ছটফট করছে। চোখদুটো তার ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে—নাক দিয়ে তার ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। মড়া জাগে—মড়া জাগে!—

ঘোঁ...ওঁ...ওঁ...ওঁৎ

মড়াটি আবার চিৎকার করে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে মড়াটি হাত তুলল, আবার টেবিলের উপর রাখল। হাঁ করে দাঁত বের করতে লাগল—তারপর ধীরে ধীরে পা তুলল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন একদৃষ্টে তার দিকে নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

মড়াটি এবার আস্তে আস্তে উঠে টেবিলের উপর বসল। একবার চারপাশে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল। এ সে কোথায় এসেছে? এই ঘর, এই বাড়ি—এর মধ্যেই কি সে মানুষ হয়েছে?

চারদিক অন্ধকার, বাইরে সারা আকাশ কান্নায় ভেঙে পড়ছে। দিকচক্রবালরেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কুয়াশায়। মড়াটি একবার পরিপূর্ণভাবে শীতল বাতাস অনুভব করল। তারপর টেবিলের উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি পড়ল ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ওপর। চোখদুটো তার আনন্দে জ্বলে উঠল। তার স্রষ্টা! তার ভগবান!!

তার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু তার স্রষ্টার মুখ ওরকম পাণ্ডুর কেন? চোখেমুখে ভয়ার্ত বিহ্বলতা কেন? সে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, তার স্রষ্টার দিকে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর থাকতে পারলেন না। দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে দরজাটা জোরে ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মড়াটি তখন দরজার ওপর প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিচ্ছিল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ক্ষোভে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এ কী হল? প্রাণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে এত সুন্দর মূর্তি এত কুৎসিত হয়ে গেল কী করে? এত সুন্দর চোখে তার ওই বীভৎস দৃষ্টি সে পেল কী করে? তাঁর আজীবন সাধনার ব্যর্থতার কথা মনে করে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

হল না, কিছুতেই মানুষ হল না—শেষপর্যন্ত কি না তিনি এক পিশাচ গড়ে ফেললেন! তাঁর ভয় হতে লাগল, যখনই মড়াটি এক পা এক পা করে টলতে টলতে হাঁটবে, তখনই তার শরীর থেকে গলিত মাংসখণ্ড এপাশ ওপাশ ছড়িয়ে পড়বে—আর ওর পোশাকের মধ্যে যে শবকীট কিলবিল করছে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেগুলো ছড়িয়ে পড়বে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর এই শোচনীয় ব্যর্থতার কথা। মাঝে মাঝে মনে করেন, ও-কথা আর ভাববেন না। তাই জোর করে ভাবতে বসেন বাড়ির কথা—তাঁর বাবা তাঁকে বারবার করে বাড়িতে ফিরতে লিখেছেন। ছোটভাই আর্নেস্ট তার আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে একই কথা লিখেছে। উইলিয়ম লেখেনি, লিখতে

পারলে নিশ্চয়ই ওই একই কথা লিখত। আর এলিজাবেথ! এলিজাবেথ লিখেছে—শবরীর প্রতীক্ষা করছে সে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল এলিজাবেথ যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করছেন।—কিন্তু এ কী! এ তো অনিন্দ্যসুন্দরী এলিজাবেথ নয়, এ যেন এক বহুদিনের মৃত কুশ্রী শব। আতঙ্কে তাঁর সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

টেবিলের উপর রাখা বাতির অল্প আলো ঘরটাকে আবছায়া করে তুলেছে। হঠাৎ তিনি দেখেন জানলা ভেঙে তাঁর জীবন-ভোর সাধনার ফল, তাঁরই অতুলনীয় সৃষ্টি সেই মড়াটি সেই ঘরে প্রবেশ করল, তারপর তার অস্থি-সর্বস্ব আঙুল দিয়ে তাঁর মশারি তুলে ধরল। ভয়ে তখন তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। কী নিষ্প্রভ তার চোখ—যদি তাকে চোখ বলা যায়!

তার চোয়ালদুটো খুলল, আস্তে আস্তে মুখ হাঁ করল, কালো ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। তারপর সে যেন কী বলার চেষ্টা করল—কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। সেই জীবন্ত কঙ্কালের মুখ দিয়ে শুধু বের হল খট্ খট্ করে কতগুলো শব্দ, যেন সমস্ত হাড়গুলো তার প্রচণ্ড বাতাসে নড়ে উঠল।

কোনো মানুষই এইরকম এক অপার্থিব জানোয়ারকে সহ্য করতে পারে না, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনও আর সহ্য করতে পারলেন না। ভয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি লেপ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিলেন। কী বিভীষিকা সৃষ্টি করেছেন তিনি! লেপে একটু টান পড়াতে তিনি বুঝতে পারলেন যে সেই দৈত্যটা তা টেনে খুলতে চাইছে। তাই তিনি জোর করে সেটি টেনে ধরে থাকলেন। ধীরে ধীরে লেপের ওপর টান চলে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ রইল কিছুক্ষণ। তারপর খট্‌খট্ শব্দে তিনি বুঝতে পারলেন সেই কঙ্কালটি চলে গেছে। তবু ভয়ে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—কখন আবার সেই পিশাচ এসে পড়বে! কান পেতে তিনি সজাগ হয়ে রইলেন, কিন্তু কোনো শব্দই আর পেলেন না। ভয়ে তাঁর বুক ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল। মানুষের বদলে এ তিনি কী সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির এ কী বিজাতীয় পরিহাস!

কখন একসময় ক্লান্তিতে ও আতঙ্কে তাঁর ঘুম এসেছে, কিন্তু সেই ঘুমে কী যন্ত্রণা! মনে হল যেন লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কাল হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে সমস্ত পৃথিবী মাড়িয়ে, ভেঙেচুরে খানখান করে দিচ্ছে। মানুষের রক্তে এই শ্যামল পৃথিবী রাঙা হয়ে উঠছে, তিনি একা সেই রক্তসাগরে দাঁড়িয়ে এই তাণ্ডবলীলা দেখছেন, আর তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছে—হে প্রভু, হে স্রষ্টা! তুমি দ্যাখো, তুমি দ্যাখো—তোমার সৃষ্টি পৃথিবীর কী সৌন্দর্য এনে দিয়েছে! তুমি যা চেয়েছিলে তা পেলে কি না!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন তাঁর বিছানায়। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এলেন ডক্টর নীল—চোখদুটো



আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, মুখের সমস্ত রক্ত ব্লটিং দিয়ে কে যেন নিঃশেষ করে মুছে নিয়েছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে দেখে তিনি বললেন—ভূত, ভূত!

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন—ভূত নয়, ভূত নয়, ডক্টর নীল! আমার সৃষ্টি অতিমানব। উহ্, আমি কী করেছি! মানুষ গড়তে গিয়ে আমি এক পিশাচ গড়েছি!

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ডক্টর নীল। বললেন—এ সেই—সেই—

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উঠে বসলেন, বললেন—হ্যাঁ, সেই। এতদিনের প্রচেষ্টা, এতদিনের সাধনা—সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কী নিদারুণ পরাজয়, ডক্টর নীল।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—চলুন। দেখা যাক্ আমরা ওকে কী করতে পারি।

দুজনে ধীরপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দেখেন সেই পিশাচটা টলতে টলতে একটা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তার পায়ের নিচে সমস্ত মেঝে যেন মট্‌মট্ করে উঠছে।

পিশাচটা তাঁদের দেখে থামল। সেই বিবর্ণ পীতাভ চোখদুটো যেন কেমন হয়ে উঠল! সে আস্তে আস্তে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অস্থিসার মুখটা বোবা কথায় শুধু খট্‌খট্ করে উঠল।

তাঁরা বিপদ গণলেন। ওই পিশাচের শক্তি-পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে। পিশাচটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁরা পিছু হটতে লাগলেন। ডক্টর নীল আর পারলেন না, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারলেন ওই দৈত্যটাকে।

এই হঠাৎ-আঘাতে দৈত্যটা থমকে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে বের হল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, তারপর দুহাত বাড়িয়ে সে দুজনের দিকে তেড়ে এল। চোখের দৃষ্টি তার যেন আরো নিষ্প্রভ, আরো করুণ হয়ে এসেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। দৈত্যটা দরজা খোলার জন্য সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে। ঘরের ভেতর রাগ ও ক্ষোভের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছুটলেন দুটো হান্টার আনতে। ডক্টর নীল গেলেন তাঁর কুকুর স্পার্কিকে আনতে। হান্টার আর কুকুর এনে তাঁরা দরজা খুলেই দরজার দুদিকে লুকিয়ে পড়লেন।

দানবটা দরজা খুলে বাইরে এল। স্পার্কি সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল; কিন্তু দৈত্যটা তাকে ঘাড় ধরে সজোরে আছড়িয়ে ফেলল মাটির উপর। তার আর নড়বার সামর্থ্য রইল না। সে আতঙ্কে ও বেদনায় কেঁউ কেঁউ করে করুণ নয়নে ওই অদ্ভুত জীবটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং ডক্টর নীল হান্টার দিয়ে তাকে সপাং-সপাং করে মারতে লাগলেন। যন্ত্রণায় এবং রাগে সে আর্তনাদ করে উঠে দুহাত বাড়িয়ে দিল তাদের ধরবার জন্য—কিংবা হয়তো সে আকুল মিনতি জানাতে চাইল এই অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের! কিন্তু হান্টারের অসহ্য পিটুনিতে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। কোথায় যাবে সে? কোথায় গিয়ে সে লুকোবে? তাঁরা দুজন নিষ্ঠুর করালের মতো হান্টার চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু আর সে বেশিক্ষণ এই হান্টারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না—টলতে লাগল। তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে সে পড়ে গেল। পাশেই কুকুরটা ভয়ে কেঁউ কেঁউ করছিল। জ্ঞান হারাবার আগে দানবটা একবার তার হাত বাড়িয়ে কুকুরের গলা টিপে ধরল। স্পার্কি আর চিৎকার করতেও পারল না।

তাঁরা দুজন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চার

ল্যাবরেটরির বিভীষিকা

যখন তাঁদের সম্বিৎ ফিরে এল তখন তাঁরা তাকে দড়ি দিয়ে খুব ভালো করে বেঁধে সেই ঘরে আটকিয়ে রেখে চলে গেলেন। বাইরের দরজায় ভালো করে লাগালেন তালা; সমস্ত জানালাগুলো ভালো করে আটকে রাখলেন। থাক সে কয়েকদিন বন্দিভাবে, অনাহারে। পরে নিজে থেকেই সে শান্ত হয়ে আসবে। তাকে ভয় করবার তখন আর কোনো কারণই থাকবে না। তারপর নিচের ঘরে গিয়ে তাঁরা বসলেন।

এই দানবের কাহিনী আর গোপন রাখা চলবে না। এর কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ তাঁকে ক্ষমা করবে না। দৈত্যটা যে জগতের একটা বিভীষিকা হয়ে থাকবে, তা ভালো করেই বুঝতে পারলেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। এখন একে হত্যা করা কী করে সম্ভব?

আকাশ পাতাল ভাবছেন তারা। এমন সময়ে দেখা গেল একটি বেয়ারার বিবর্ণ মুখ। তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—একটা ভূত জলের পাইপ বেয়ে নামছে।

ভূত! তাঁরা তক্ষুনিই বুঝতে পারলেন কে সে! দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলেন। কখনই-বা তার জ্ঞান হল, আর কী করেই-বা সে পালাল! ছুটে গেলেন দোতলায়, দরজায় তালা লাগানো ঠিকই আছে। দুজনে হান্টারদুটো তুলে নিলেন, বেয়ারাটাকে নিয়ে আসতে বললেন একটা কম্বল।

তিনজনে ছুটে বাগানে জলের পাইপটার নিচে এসে দাঁড়ালেন। ডক্টর নীল নিলেন কম্বলটা। তাঁদের হাতে আবার সেই হান্টার দেখে দানবটা পাইপ বেয়ে নামতে নামতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করে উঠল, তার চোখদুটোতে এক উন্মত্ত হিংস্রতা ফুটে উঠল। বোধহয় একটু সে দ্বিধান্বিত হল—উপরে উঠে যাবে, না নিচে নামবে। তারপর হঠাৎ সে লাফিয়ে পড়ল বাগানের ওপর।

ডক্টর নীল ঠিক এই মুহূর্তের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। দৈত্যটি মাটির উপর থেকে উঠবার চেষ্টা করার আগেই তিনি কম্বলটা নিয়ে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার সর্বশরীর ঢেকে ফেললেন। দৈত্যটাকে কিছু বুঝতে দেওয়ার



আগেই তাকে বন্দি করা হল, তারপর হান্টারদুটো তার গায়ে সাপের মতো লাফিয়ে উঠল।

দানবটা রুদ্ধ আক্রোশে ছট্‌ফট্ করতে লাগল কিন্তু হান্টারের তীব্র জ্বালায় ধীরে ধীরে আবার সে নিশ্চল হয়ে এল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—কী বোকামিই-না করেছি! শুধু শক্তি দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি, কিন্তু বুদ্ধি আর বিবেচনা দিতে পারলাম না!!

দৈত্যটাকে নিয়ে গিয়ে আবার সেই ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। এবার তাকে খুব ভালো করে বেঁধে রাখা হয়েছে, যাতে আর সে কোনো রকমে মুক্তি না পায়। সেই ঘরের বাইরে একটা বেয়ারাকে পাহারা রাখা হয়েছে তার ওপর লক্ষ রাখার জন্য, যাতে পালাবার সামান্যতম চেষ্টা করলেই তাঁরা প্রস্তুত হতে পারেন।

দুদিন তাকে রাখা হল একেবারে অনাহারে। জলও তাকে দেওয়া হয়নি একফোঁটা। খেতে না পেলে সে নরম হবে, তার আগে নয়। তারপর অপারেশন করে এর শক্তি কমানোর না-হয় চেষ্টা করবেন।

তৃতীয় দিনে দানবটি নির্জীবের মতো হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের উপর। তার চোখ শুধু স্থির রয়েছে বেয়ারাটির দিকে। সে শুধু একবার মুক্তি চায়... মুক্তি, মাত্র একবার। তারপর সে দেখে নেবে কোথায় মানুষের অত্যাচারের সীমা, কতটুকু মানুষের ক্ষমতা—কেমন-বা তাদের পৃথিবী!

বেয়ারাটি এক গ্লাস জল তুলে নিল। দৈত্যটির তাই দেখে চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। যেন শত শত শতাব্দীর পিপাসা তার বুকে। কত থর, গোবি, সাহারা যেন সে নিরম্বু উপবাসে পার হয়ে এসেছে। আজ যেন শত শত যুগের তৃষাতুর মরু-যাত্রী দেবদারু ও দারুচিনি সমাকীর্ণ একটি ছায়াময় শীতল উপবন দেখেছে, তার মাঝে এক সুন্দর দিঘি জলে টলটল করছে।

একবার সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল বাঁধন ছেঁড়বার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক গর্জন করল—আঁ আঁ আঁ...

চমকে উঠল বেয়ারাটি। সেই পিশাচটির চোখে তখন দানবের ক্ষুধা, বাহুতে দানবের শক্তি, বুকে তার দানবের পিপাসা। প্রবল টানে বাঁধন গেল ছিঁড়ে, সে আর একবার আকাশ ফাটিয়ে বিজয়গর্বে চিৎকার করে উঠল—আঁ আঁ আঁ....

একনিমেষে সে জানলার গরাদ ভেঙে ফেলল, তারপর সেই দৈত্যটি কেড়ে নিল জলের গ্লাস। এক চুমুকে সে তা নিঃশেষ করল। তারপর ভয়-বিহ্বল মূক বেয়ারাটিকে তুলে নিল দুহাত দিয়ে এবং মাটিতে আছড়াতে লাগল। বেয়ারাটি চিৎকার করে উঠল। কিন্তু আজ সে রক্তের স্বাদ পেয়েছে। তার হাত থেকে বেয়ারাটির রক্ষার কোনো আশা ছিল না।

হঠাৎ সে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল, তাকে ধরবার জন্যই এরা ছুটে আসছে। সে পালাবার জন্য দরজার দিকে এগোতে লাগল। দরজার সামনে এসেই কিন্তু সে থমকিয়ে দাঁড়াল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং ডক্টর নীল তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। হতাশায় এবং বেদনায় সে আর্তনাদ করে উঠল।

'ফায়ার প্লেস' থেকে দুটো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিলেন তাঁরা। কাঠদুটোকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে সে ভয়ে পিছু হটতে শুরু করল, সারা ঘর কাঁপিয়ে তার বিরক্তি জানাল—আঁ আঁ আঁ...

তাঁরাও সেই আগুন নিয়ে তাকে কোণঠাসা করতে লাগলেন। আর উপায় নেই দেখে নতুন শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য সে আগুনের ওপর মারল এক থাবা। কিন্তু শত্রু যেন সমস্ত শরীরে তার বিষাক্ত সুচ ফুটিয়ে দিল। কী অসহ্য যন্ত্রণা!

চারদিকে তার শত্রু। আগুন তার লক্‌লকে জিভ বের করে তেড়ে আসছে। হতাশায়, রাগে ও ক্ষোভে সে গর্জন করতে লাগল।

এ কোন্ জীব সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু এটি যে তার শত্রু, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তারা যে প্রকৃতির মতো নিষ্ঠুর হয়ে অসহায় নিরস্ত্রের ওপর পাশবিক উল্লাসে অত্যাচার করতে পারে, তা সে দেখেছে। কুকুরের মতো জীবের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এ কী ধরনের শত্রু যার চোখের জ্যোতিতে সমস্ত ঘর জ্বলে ওঠে—যার নিশ্বাসে অসহ্য তাপ, আর যার লক্‌লকে জিভ সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়? মানুষ তাকে ভয় পায়, কুকুর তাকে ভয় পায়, কিন্তু এই নতুন শত্রু যেন তার দিকে রাক্ষসের মতো তেড়ে আসে। একবার এই আগুনকে তার শক্তি সে দেখিয়ে দেবেই।

সর্বাঙ্গ জ্বলতে শুরু করলেও সে সেই অগ্নিব্যূহ ভেদ করবার জন্য প্রবল বিক্রমে সংগ্রাম চালাল। কিন্তু কতক্ষণ সে আর অনাহারে দুর্বল শরীরে দাঁড়াবে? তার মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে—একবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। এখনি একে অপারেশন করে ফেলতে হবে।

ডক্টর নীল জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু তাতে কি বিশেষ কোনো লাভ হবে?

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উত্তর দিলেন—দেখা যাক্। যদি না হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হত্যা করব।

দুজনে ধরাধরি করে অপারেশন টেবিলে দৈত্যটাকে তুললেন। দৈত্যটি মড়ার মতন নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। এই অস্ত্রোপচার সে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ! যদি না পারে, যদি তার মৃত্যু হয়—সে-ও তবু ভালো। যার সাধনায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তাঁর সমস্ত জীবন, বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন—সে যে তাঁকে এত বেদনা দেবে, তা তিনি ধারণা করতে পারেননি। তিনিই তাঁর প্রাণ দিয়েছেন, যদি তার প্রাণ যায়ই—যাক্ তাঁরই হাতে। তিনি পাশের ঘর থেকে অপারেশনের সাজসরঞ্জাম আনতে গেলেন।

ঘরে যেন চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দৈত্যটি মুহূর্তের মধ্যে উঠে বসল এবং পরক্ষণেই ডক্টর নীলকে একটুও সময় না দিয়ে প্রবল শক্তিতে তাঁর গলা টিপে

ধরল। ডক্টর নীল একটুও শব্দ করতে পারলেন না। মুখের কষ বেয়ে এক ঝলক রক্ত নেমে এল শুধু।

দৈত্যটি তাঁকে মাটিতে ফেলে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। এখনি তার জীবনদাতা, তার স্রষ্টা আসবেন এ-ঘরে। আর এ-ঘরে থাকা তার পক্ষে উচিত হবে না। বড় কৌশলী আর বুদ্ধিমান এই মানুষ জাতটা। সে জানলা দিয়ে বাগানে লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই রাস্তায়। আজ মুক্তি!—মুক্তি!! তাকে বাধা দিতে আর কেউ কোথাও নেই। তার চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। তারপর দ্রুতগতিতে সে ঘনায়মান অন্ধকারে মিশে গেল।

পাঁচ

তারপর

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফিরে এলেন সাজসরঞ্জাম নিয়ে। এসেই তাঁর মাথাটা ঘুরে গেল। এ কী হয়েছে! ডক্টর নীল ঘাড় গুঁজে পড়ে আছেন। গলার উপর কালো পাঁচটা আঙুলের দাগ—আর সেই দৈত্যটা নেই। খোলা জানলাটা যেন তাঁর বোকামির জন্য বিদ্রূপ করছে। এত করেও শেষপর্যন্ত এত ভুল! একটি ভুলের জন্য ডক্টর নীলের মৃত্যু হয়েছে, না জানি আরো কত বড় মাশুল দিতে হবে।

সমস্ত শরীর তাঁর ঝিমঝিম করে উঠল। উহ্ কী ভুলই তিনি করেছেন দৈত্যটাকে ভালো করে না-বেঁধে রেখে। মুক্ত হয়ে এখন দৈত্যটা যে কী না করবে বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

এই ল্যাবরেটরিতে এখন তিনি নিঃসহায়, একা। একা তিনি আর কী করতে পারেন? যদি দৈত্যটা আসে তাঁকেও হত্যা করতে, একা তিনি কী করে আত্মরক্ষা করবেন?

একবার মনে হল, হয়তো আর সে ফিরবে না। উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরে, দেবদারু, পাইন, চেরি, পিচের বনে, বড় বড় বাড়ির ছাদে, কুয়াশার ভিড়ের মধ্যে হয়তো সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তারপর যখন আলো ফুটবে, যখন পথে লোকজন চলাফেরা করবে, তখন ওই অপমূর্তিকে দেখে সকলে প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করবে, সমস্ত দেশে একটা হৈ-চৈ শুরু হবে। আর পিশাচটা নরহত্যা করে সুন্দর পৃথিবীর বুক রক্তে রাঙা করে দেবে।

ভয়ে আর চিন্তায় তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে মৃত ডক্টর নীল এবং বেয়ারাকে তাঁরই বাগানে কবরস্থ করলেন। তারপর সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে তিনি বসে রইলেন।

বাইরে বেরোতে সাহস হচ্ছে না, কী জানি কোথায় সেই দানবমূর্তি লুকিয়ে আছে। খাওয়ার কথা মনে এল না। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন তাঁর গবেষণার ব্যর্থতার কথা, সমস্ত জীবনের সাধনার ধূলিসাৎ হওয়ার কথা। মৃত্যুকে তিনি প্রাণে সঞ্জীবিত করেছেন সত্য, কিন্তু এ কী নিদারুণ পরাজয়! অতিমানবের পরিবর্তে এ কী এক রক্তপিশাচের সৃষ্টি! তাঁরই অদূরদর্শিতার জন্য দুই নিরীহ লোকের রক্তপাতে পৃথিবী এখনই কলুষিত হয়ে

উঠেছে। মনের মধ্যে এক গ্লানি ধূমায়িত হয়ে উঠছে—ডক্টর নীল আর সেই বেয়ারার মৃত্যুর জন্য তিনিই কি দায়ী নন? হত্যাকারী কি শুধু সেই পিশাচটি? না—না—তিনি—তিনিই প্রকৃত হত্যাকারী!

দুপুর, বিকেল, রাত—একইভাবে কেটে গেল উদ্বিগ্ন চিন্তায়। ভোর হল, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে রয়েছে। ঘরের দরজা খুলতে তাঁর সাহস হল না। কে জানে যদি সেই দানবটা আবার আত্মপ্রকাশ করে!

এক অনিশ্চিত আশঙ্কায়, এক দুঃসহ অসহায়তায়, এক অস্থির উদ্বিগ্নতায় ল্যাবরেটরির সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দিন কাটে। নিঃসঙ্গ সময় বিরাট পাথরের মতো চেপে বসে থাকে—নড়ে না। এক অনিশ্চিত সংশয় বাজপাখির মতো পাখা মেলে সমস্ত আকাশ কালো করে রয়েছে, তার ক্রূর শ্যেনদৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। একটু সুযোগ পেলেই সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর ওপর।

দিনের সূর্য পশ্চিমে যাওয়ার সময় দীর্ঘ ছায়া ফেলে। ছায়া দীর্ঘতর হয়। তারপর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছায়া, সমস্ত আকাশে অন্ধকার। তার মাঝে এই ল্যাবরেটরি এক দৈত্যপুরী, রূপকথার চিরন্তন রাজপুত্রের মতো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নিষ্ঠুর করাল দৈত্যের পদধ্বনি শুনে যান। অন্ধকার রাত্রি যেন কাটে না। চারদিকে বিভীষিকার ছোটাছুটি, চারদিকে ভয়...ভয়...। সেই অন্ধকার ভেদ করে কখন বেরিয়ে আসবে হিংস্র কদাকার রক্তলোলুপ্ত পৈশাচিক এক মুখ, নিঃশব্দ অন্ধকার ভেঙে সাদা দাঁত বের করে খট্‌খট্‌ করে বলবে—আমি এসেছি; রক্ত চাই আমি। হে আমার স্রষ্টা, আমার বজ্র-কঠিন হাতে একবার ধরা দাও।

এইভাবে একের পর এক সুদীর্ঘ দিন, সুদীর্ঘতর রাত কেটে যায়। একই উৎকণ্ঠায়, একই আতঙ্কে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নিঃসঙ্গ দিন কেটে যায়। মনে হয়, দূরে কোথাও এক অশরীরী ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেই দৈত্যকে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি। মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, এই তুষার-ঝরা কঠিন শীতের রাতে আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন সেই দানবটি হয়তো ঠাণ্ডায় জমে বিনষ্ট হয়েছে। একটু আশার আলোয় মুখ উদ্ভাসিত হওয়ার পরমুহূর্তেই সংশয়ের কালো ছায়া এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। একা নির্বান্ধব এই সংশয়ে দিনের পর দিন থাকায় তাঁর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছিল।

সেদিন সকাল থেকে ঝড়! আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত তুষার ঝরে পড়ছে। এমন সময় মনে হল—কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন চমকে উঠলেন। তবে কী—তবে কী—?

সমস্ত শরীরের রক্ত জমাট হয়ে উঠল যেন!

আবার...আবার দরজায় ধাক্কা! মনে হল একবার চিৎকার করে ওঠেন : কিন্তু এই জনমানবহীন বিজন প্রদেশে কে তাঁর চিৎকারে সাড়া দেবে?

—ভিক্টর! ভিক্টর!!

কার যেন নিচ থেকে গলা শোনা যায়! ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। এ যে—

—ভিক্টর! ভিক্টর!!

হ্যাঁ—এ যে ক্লেরভালের কণ্ঠস্বর! ক্লেরভাল—তাঁর চিরসুহৃদ এসেছে । আড়ষ্ট শরীর একমুহূর্তে যেন সচল হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে তিনি সদর দরজা খুললেন।

ক্লেরভাল ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন; বললেন—এ কী হয়েছে বন্ধু তোমার? চেহারা কেমন করে এমন বিশ্রী হল?

গলা, হাত এবং পা কাঁপছিল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের। মনে হল যেন একটুও দ্বিধা না করে এই মুহূর্তে সব কথা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তিনি তাকে বলে এই ভারাক্রান্ত হৃদয়কে একটু হাল্‌কা করে ফেলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত সাহস হল না। শুধু অস্ফুটস্বরে বললেন—কাজের চাপে শরীরের ওপর অত্যাচার হয়েছে যথেষ্ট। তাই—।

বন্ধুকে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। যদি সেই বিকট মূর্তির সঙ্গে আবার দেখা হয়। তাঁর যে শাস্তি হবার তা তো হয়েছেই, মিছিমিছি কেন বন্ধুর সুখ-শান্তি হরণ করবেন? ক্লেরভালকে সেখানে বসিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে ভয়ে ভয়ে তিনি উপরে উঠে গেলেন। কান পেতে যেন কিছু শুনতে চাইলেন। কিন্তু না, সেখানে কোনো শব্দ নেই। বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরটায় একবার উঁকি মারলেন। না, সে নেই। সে নেই—ইচ্ছা হল, মনের আনন্দে একবার প্রাণ খুলে হাসেন, কিন্তু পারলেন না। চোখের কোণে শুধু অশ্রু জমে উঠল। সে কি আনন্দে, না বেদনায়? তাঁর সৃষ্ট প্রথম অতিমানবের বিভীষিকাময় উপস্থিতির অভাবের স্বস্তিতে, না তাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলার ব্যথায়?

ক্লেরভালকে নিয়ে বসবার ঘরে এলেন তিনি। মনের উদ্বেগকে চাপবার জন্য অফুরন্ত কথা বলে যেতে লাগলেন, কিন্তু সবই যেন অবান্তর এবং সবই যেন অসঙ্গত প্রলাপ বলে নিজেই বুঝতে পারছিলেন। তবু এতদিন পর একটু কথা বলার সুযোগ পেয়ে তিনি আর থামতে পারছেন না।

ক্লেরভাল প্রশ্ন করলেন—তোমার কী হয়েছে? চোখমুখের অবস্থা এমন হয়েছে কেন? তুমি অত কথা বলছ কেন?

কিছুই না, এমনি হয়তো।—ম্লানমুখে জবাব দেন তিনি।

একসময় ক্লেরভাল জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার রিসার্চের কতদূর? আর ডক্টর নীল-ই বা গেলেন কোথায়!

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখের সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হয়ে গেল। মনে হল যেন সেই বিরাটকায় দৈত্য তাঁর সামনে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে—হে প্রভু আমার, এবার তোমার পালা। তুমি এসো! তুমি এসো!!

ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। হেনরি, আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

ক্লেরভালের শুশ্রূষায় একবার বোধহয় তাঁর জ্ঞান হয়েছিল—একটু একটু যেন মনে পড়ে। ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন, কিন্তু বড় দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

আচ্ছন্ন অচেতনতায় এরপর কেটে গেল কয়েকটি সংজ্ঞাহীন দিন—এক নিঃসীম তুষার-মরুর ভেতর দিয়ে তিনি যেন চলেছেন রাত্রিদিন নিঃসঙ্গ, একাকী। কোনোদিন আর বোধহয় সেই মরুভূমি পার হয়ে সবুজ মাটির সন্ধান তিনি পাবেন না; পাবেন না তিনি আর কোনো পরিচিত মুখের দেখা। নির্জন নিষ্পাদপ তুষারের মধ্যে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে থাকবে, সূর্যের ক্লান্ত রোদে তাঁর অস্থি এতটুকু উষ্ণতা বোধ করবে না।

দিনরাত ক্লেরভাল পড়ে রইলেন তাঁর বন্ধুর পাশে। বন্ধুর অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-সাধনাকে তিনি কোনোদিনই স্বাগত জানাতে পারেননি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঘরবাড়ি ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দূরে এক বিজন প্রদেশে ল্যাবরেটরির মধ্যে একা একা কাজে ডুবে থাকার ফল যে শেষপর্যন্ত ভালো হতে পারে না—তা তিনি জানতেন। তবু মাঝে মাঝে তিনি এখানে এসেছেন, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছেন, তর্ক করেছেন, বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ করেছেন—শেষপর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না-পেরে রাগ করে চলেও গেছেন। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মা'র মৃত্যুর পর সংবাদ পেয়েও যখন দেখলেন যে তিনি বাড়িতে এলেন না, তখন ক্লেরভালের রাগের আর সীমা ছিল না। কিন্তু বন্ধুর পরিবারের সকলের বেদনাকর পরিস্থিতি আর করুণ অসহায়তার কথা মনে করে তাদের ঠিকমতো কোনো ব্যবস্থা না করে বন্ধুর সঙ্গে এর শেষ মীমাংসা করার কথা ভাবতে পারেননি। প্রথমেই যখন সময় পেলেন তখনই তিনি বন্ধুর কাছে ছুটে এলেন; কিন্তু তাঁর চিরদিনের ভয় ততদিনে ফলিষ্ণু হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের অস্থিরচিত্ততা ও অসংলগ্নতা দেখে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস হল যে অত্যধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। বন্ধুর এই শোচনীয় পরিণতিতে তাঁর মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল, চোখদুটি সজল হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির করলেন, একটু সুস্থ হলেই তাঁকে তিনি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

ক্লেরভালের সেবা-শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় বেশ কয়েক দিন পরে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সুস্থ হয়ে উঠলেন। ক্লেরভাল বন্ধুর সঙ্গে অত্যধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কুফল নিয়ে তর্ক করার চেষ্টা করামাত্রই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বলে উঠলেন—তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা ভালো, না মন্দ—সে সম্বন্ধেও একটা কথা বলব না। তবে আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে আর আমি গবেষণা করব না। আমি পরাজিত। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম, জয়ের নেশায় আমি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি; কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব, পরাজিত ও বিধ্বস্ত। এতখানি আত্মগ্লানি নিয়ে আর গবেষণা করা সম্ভব নয়। তোমাকে কথা দিচ্ছি বন্ধু—এই শেষ। তুমি চলে যাও, আর কয়েকদিন পরে এই ল্যাবরেটরির একটা ব্যবস্থা করে আমিও দেশে ফিরে যাব।

জেনেভাতে ক্লেরভালের অনেক কাজ পড়ে ছিল। তাই বাধ্য হয়ে বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে ক্লেরভাল একা ফিরে গেলেন।

ক্লেরভাল চলে গেলে পর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের একে একে মনে পড়ল আগেকার সমস্ত কথা। তাঁর সৃষ্টি সেই অপার্থিব বীভৎসতা। ক্লেরভাল কি তার খবর জানে? তাকে কি সে দেখেছে? কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, না—ক্লেরভাল নিশ্চয়ই দেখেনি, দেখলে সে তাঁকে এ-কথাটা জানাত।

ঘরের থেকে বেরিয়ে তিনি একবার বাইরের দিকে তাকালেন। দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষার-মুকুট সোনালি রোদে ঝকমক করছে, পপলার গাছগুলো মাথা দুলিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী রঙিন হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

চারদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তিনি, কোথাও সেই দুষ্ট রাহুর চিহ্ন নেই। এক প্রসন্ন শান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। মনে হল যেন তিনি আবার নতুন করে জীবন লাভ করলেন। আর বোধহয় সেই বিকট উপদ্রব এখানে মুখ দেখাতে আসবে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে নিশ্চয়ই এই দুঃসহ শীতে বাইরে জমে সে মারা গেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বাঁচলেন।

এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার সদিচ্ছা তাঁর মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। দেশে ফিরে যাওয়ার দিন একটু একটু করে পিছিয়ে দিতে লাগলেন।

একদিন তিনি বেড়িয়ে ফিরে দেখলেন যে বাইরের ঘরে টেবিলের উপর তাঁর বাবার একটা চিঠি পড়ে আছে। একনিমেষে তাঁর আবার মনে পড়ে গেল বাবা, উইলিয়ম, আর্নেস্ট ও এলিজাবেথের কথা। বাড়ির সুন্দর জীবনের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তাই ভালো—সেখানেই চলে যাবেন তিনি। সকলের সঙ্গে একত্র থাকলে এই অনিশ্চিত বিভীষিকার হাত থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা করা যাবে। আর তা ছাড়া মা'র মৃত্যুর পর একবার সকলের সঙ্গে দেখা করাও প্রয়োজন!

কিন্তু চিঠিখানা খুলে তিনি নিশ্চল হয়ে গেলেন। হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। তিনি পড়তে লাগলেন :

> *প্রিয়তম ভিক্টর,*
>
> ক্লেরভালের কাছ থেকে জানলাম যে তুমি শীঘ্রই দেশে ফিরে আসছ। তুমি ফিরে এলে তোমাকে আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাব—একথা যদি মনে করে থাকো, তা ভুল—ভুল। তুমি এসে আমাদের হাসিমুখ দেখবে যদি মনে করে থাকো তো আশ্চর্য হবে আমাদের চোখে জল দেখে। ভিক্টর, তোমাকে কী করে আমাদের এতবড় সর্বনাশের খবর দেব?
>
> ভিক্টর, উইলিয়ম মারা গেছে। সত্যকথা বলতে গেলে উইলিয়মকে কে যেন হত্যা করেছে। তোমাকে সান্ত্বনা দেব না, শুধু ঘটনাটা আমি লিপিবদ্ধ করছি।

গত বৃহস্পতিবার আমি, এলিজাবেথ আর তোমার দুই ভাই উইলিয়ম ও আর্নেস্ট বেড়াতে গেছিলাম। জায়গাটা এত সুন্দর যে ফিরতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। ফেরার সময় উইলিয়ম ও আর্নেস্টকে দেখতে পেলাম না। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আর্নেস্ট ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করল যে আমরা উইলিয়মকে দেখেছি কি না। সে জানাল যে তারা দুজনে লুকোচুরি খেলছিল। উইলিয়ম দৌড়ে গিয়ে কোথায় যে লুকোল, আর্নেস্ট তাকে খুঁজে পায়নি।
একথা শুনে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। রাত অন্ধকার হয়ে না-আসা পর্যন্ত আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ বলল, হয়তো সে বাড়ি ফিরে গেছে। আমরা ছুটে এলাম বাড়িতে, কিন্তু সেখানেও সে নেই। আবার আমরা আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই শীতের রাতে অন্ধকারে একা না-জানি সে ভয়ে কী করছে। ভোর প্রায় পাঁচটার সময় তার খোঁজ পেলাম—সুন্দর ফুটফুটে উইলিয়ম ঘাসের উপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। তার গলায় হত্যাকারীর আঙুলের চিহ্ন তখনো জ্বলজ্বল করছে। তোমার মা'র ছবি মীনে-করা সোনার লকেটটা তার গলায় ছিল, সেটি পাওয়া গেল না। সেই সোনার লকেটের লোভে ফুলের মতো সুন্দর ছেলেটিকে দস্যু হত্যা করেছে। এলিজাবেথ শোকে পাগল হয়ে উঠেছে। আর্নেস্টের ধারণা : সে-ই তার ছোটভাই-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী, কারণ সে লুকোচুরি খেলতে না চাইলে উইলিয়মের এভাবে মৃত্যু হত না। আমাদের এরকম সুখের বাড়িতে আজ গভীর বিষাদের ছায়া সকলের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। হত্যাকারী আজও ধরা পড়েনি; কিন্তু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত অনুসন্ধানে তার ধরা পড়তেই হবে।
ভিক্টর, তুমি তাড়াতাড়ি এসো। তুমি ছাড়া এলিজাবেথকে আর কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না। তুমি এলে আমরা সকলেই মনে বল পাব। ইতি—

তোমার হতভাগ্য বাবা

উইলিয়মের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন শোক-বিমূঢ় হয়ে গেলেন। আর দেরি করলেন না, সেইদিনই তিনি জেনেভার পথে বেরিয়ে পড়লেন। এখানে থাকতেও তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল না, একা থাকবার খুব সাহসও ছিল না—কখন আবার সেই বিরাটাকার দানব সামনে এসে দাঁড়াবে। তা ছাড়া, মনে মনে ভাবলেন তিনি, উইলিয়মের হত্যাকারী সেই দস্যুকে ধরে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করাও প্রয়োজন।

কিন্তু সে যাত্রা কী বেদনাময়। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল যে যত শীঘ্র পারা যায় তিনি যাবেন, কিন্তু যতই তিনি যেতে লাগলেন ততই মনের কোণে বিষাদ জমে

তাঁর গতিকে মন্থর করে তুলতে লাগল। চারদিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, শুধু তুষার আর তুষারের পাহাড়। আকাশ থেকে আরম্ভ করে মাটি পর্যন্ত সমস্ত যেন তুষারের সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আকাশে পাহাড়ে গাছপালায়—সব জায়গায় যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন এক করুণ আর্তনাদ। আকাশের আলো যেন নিভে আসতে লাগল।

অতীতে কতবার তিনি এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছেন, তার সুখকর স্মৃতি মনে পড়ল; কিন্তু মাত্র এই একটি আঘাত কেমন করে যেন এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। সর্বত্রই যেন তিনি নাম-না-জানা বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভয়ে সমস্ত শরীর যেন তাঁর পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল।

দুদিন অপেক্ষা করলেন তিনি সুজানে।

ছয়

দানবের অপকীর্তি

লেকের পাশ দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দেশ জেনেভায়। দূর থেকে তিনি দেখলেন তুষারশৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ। তার সৌন্দর্যে তাঁর পূর্বস্মৃতি আবার জেগে উঠল, তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন—আমার সোনার দেশ, আমার সোনার পাহাড়, তোমাদের প্রবাসী ছেলে আজ ঘরে ফিরে আসছে। তোমাদের মুখে প্রশান্তির ছবি—তা কি আমাকে সান্ত্বনা দিতে, না আমার গভীর দুঃখে ব্যঙ্গ করতে?

যতই জেনেভার দিকে এগোতে লাগলেন, ততই এক বিমর্ষ বিষণ্ণতা আর অনিশ্চিত ভয়ে তাঁর মন ভরে উঠল। নিঃশব্দ চরণে কখন চারদিকে রাত নেমে এসেছে, অন্ধকার পাহাড়ে কুয়াশার আস্তরণ। সমস্ত পৃথিবী যেন এক বিরাট নির্মম বিভীষিকার ছবি।

যখন জেনেভায় এসে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পৌঁছুলেন, তখন নগরীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সকাল না হলে আর জেনেভায় প্রবেশ করা যাবে না। বাধ্য হয়ে তাঁকে নগরীর থেকে কিছুদূরে সেকেরন গ্রামে সেই রাতের জন্য থাকতে হল। সমস্ত আকাশ কালো, একটি তারার চোখও দেখা যাচ্ছে না। তিনি মনে মনে এক নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এরই কাছে তার ছোটভাই উইলিয়ম নিহত হয়েছে। যেই এই কথা মনে হল, তক্ষুনি তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রিয়তম ভাইয়ের মৃত্যুস্থান একবার দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

পথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। আকাশে তখন ঘনঘটা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই আলোর প্রতিফলনে মঁ ব্লাঁর তুষারশৃঙ্গ আলোকিত হয় উঠে কত রকমের সুন্দর ছবি এঁকে যাচ্ছে। গাছপালা কাঁপিয়ে ঝোড়ো বাতাস ছুটে আসছে; তিনি একটি ছোট টিলার উপর উঠে দাঁড়ালেন।

বৃষ্টি শুরু হল। তিনি হাঁটতে লাগলেন। কাছেই ভীষণ শব্দ করে বজ্রপাত হল, তার প্রতিধ্বনি দূরের মঁ ব্লাঁ আল্পস থেকে ফিরে এল। বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, সামনের জেনেভা লেক মনে হল এক অগ্নিকুণ্ড। তারপর নিরন্ধ্র অন্ধকার।

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সেই সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন কাছেরই এক ঝোপের ভিতর থেকে এক

কালো মূর্তি আত্মপ্রকাশ কলল। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। বিদ্যুতের আলোর ঝলকে সেই মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার দানবীয় বিকলাঙ্গ চেহারা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই সেই শয়তান, সেই নিষ্ঠুর দৈত্য—যাকে তিনি জীবন দান করেছেন। এই শয়তান এখানে কী করছে? তবে কি—তবে কি এই শয়তানই তাঁর ভাইকে হত্যা করেছে? একথা মনে করতেই তাঁর দেহের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে এল। তিনি একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। সেই মূর্তিটি মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে অতিক্রম করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোনো মানুষ ফুলের মতো সুন্দর ছেলেকে হত্যা করতে পারে না। নিশ্চয়ই এই শয়তানই হত্যাকারী! একবার মনে হল যে তার পিছু তিনি ধাওয়া করেন, কিন্তু সেই দৈত্য মঁ সালেভের খাড়া চূড়া ডিঙিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারারাত তিনি এক অস্বস্তিকর মানসিক যন্ত্রণায় কাটালেন। বাইরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাঁর মানসিক অস্থিরতা যেন আরো বেড়ে গেল। একটির পর একটি কলুষ বিভীষিকাময় দৃশ্যের ভিতর দিয়ে তাঁর কল্পনা ছুটে চলল। তাঁর শুধু মনে হতে লাগল সেই অমানুষিক অপার্থিব জীবের কথা—যাকে তিনি বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার রূপে সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে তিনি জীবন ও শক্তি দিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি মনুষ্যসমাজে বিচরণ করতে ছেড়ে দিয়েছেন, যার একটির পর একটি নৃশংস কুকীর্তিতে নিজের ওপর ঘৃণা ছাড়া আর তাঁর কিছুই মনে আসে না।

এইভাবে যন্ত্রণাময় এক সুদীর্ঘ রাত কেটে গেল। জেনেভা নগরীর দরজা খোলামাত্র তিনি ছুটে বাড়িতে এলেন। প্রথমেই দেখা হল এলিজাবেথের সঙ্গে। তাকে দেখে এলিজাবেথ কেঁদে ফেলল। বলল—ভিক্টর, তুমি এলে, কিন্তু আর কিছুদিন আগে এলে না কেন? কত দুঃখের মধ্যে তুমি এলে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা কেমন আছেন?

ভালোই আছেন—এলিজাবেথ উত্তর দিল।—হত্যাকারী ধরা পড়ার পর থেকেই—

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন চিৎকার করে উঠলেন—হত্যাকারী ধরা পড়েছে? অসম্ভব! কে তাকে ধরতে পারবে? কার এত ক্ষমতা আছে? এর চেয়ে বরং ঝড়ের চেয়ে জোরে ছোটা সম্ভব! আমিও তাকে দেখেছি, কাল রাত পর্যন্ত সে মুক্ত ছিল।

এলিজাবেথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—তুমি কী বলছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়ার পর আমরাও একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি, তার বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাড়ির কেউ এখনো বিশ্বাস করে না। কে বিশ্বাস করতে পারে যে আমাদের এতদিনকার পরিচারিকা জাস্টিন—যে উইলিয়ম আর আর্নেস্টকে ছেলের মতো মানুষ করেছে—সে-ই উইলিয়মকে হত্যা করবে? এতবড় ঘৃণ্য পাপ করবে!

—জাস্টিন! অসম্ভব। তাকেই কি হত্যাকারী বলে ধরা হয়েছে?

—হ্যাঁ। বিশ্বাস হয় না, তবু তার বিরুদ্ধে এত প্রমাণ! তাছাড়া উইলিয়মের মৃত্যুর পর থেকে তার হাবভাবও কেমন যেন অদ্ভুত। আজই তার বিচার হবে, তখনই সব কথা পরিষ্কার হবে।

এলিজাবেথ জানাল যে উইলিয়মের মৃত্যুর পর জাস্টিন বেশ কয়দিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। সেই সময় বাড়ির এক চাকর তার জামাকাপড় খুঁজতে খুঁজতে উইলিয়মের মৃত্যুর দিন সে যে-জামা পরেছিল, তার পকেট থেকে তোমার মা'র মীনে-করা লকেটটা পায়। সে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে সোজা পুলিশকে গিয়ে খবর দেয়। পুলিশ তাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে।

আশ্চর্য এই কাহিনী। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—এলিজা! তোমরা সকলে ভুল করছ। জাস্টিন নির্দোষ, আমি জানি কে হত্যাকারী!

এমন সময় ধীরে ধীরে ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে এলিজাবেথ বলে উঠল—শুনেছেন, ভিক্টর জানে যে কে হত্যাকারী!

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাবা আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন—আমাদেরও দুর্ভাগ্য যে আমরাও তাকে জানি।

এলিজাবেথ বলল—ভিক্টর বলছে জাস্টিন নয়, জাস্টিন নির্দোষ।

উত্তর এল—তাই যেন হয়, জাস্টিন যেন নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মন কিছুটা স্থির হল। জাস্টিনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ দাখিল করা সম্ভব নয় বলে সে খালাস পেয়ে যাবে। তাঁর হত্যাকারীর কাহিনী এত অবাস্তব এবং এত অবিশ্বাস্য যে সকলকে সে কাহিনী বলাও যাবে না, কেউ বিশ্বাসও করবে না।

এগারোটায় জাস্টিনের বিচার হবে। সপরিবারে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আদালতে উপস্থিত হলেন। বিচারের এই প্রহসনের সমস্তক্ষণ তিনি নরকযন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর কৌতূহল ও বেআইনি কাজের ফলে যে শিশু নিহত হয়েছে, চিরকালের জন্য সেই হত্যার ঘৃণ্য অপবাদ মাথায় নিয়ে জাস্টিন জীবিত থাকবে কি? অথচ এই সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী একমাত্র তিনি। হাজার বার তিনি সকলের সামনে এই হত্যার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। সমস্ত অপরাধ তিনি স্বীকার করতে পারলে খুশিই হবেন—কিন্তু হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় তিনি এতদূরে ছিলেন যে কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না, পাগলের প্রলাপ বলে তাঁর কথা উড়িয়ে দেবে।

বিচার আরম্ভ হল। জাস্টিনের মুখ ভীতিহীন; সে নির্বাক হয়ে বসে আছে। শত চক্ষুর উৎসুক দৃষ্টিতেও সে বিচলিত নয়।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবৃত করলেন সরকারি উকিল। উইলিয়মের হত্যাকাণ্ডের দিন সারারাত জাস্টিন বাড়িতে ছিল না। ভোরের দিকে তাকে একজন দেখতে পায় হত্যাস্থানের কাছাকাছিই। সেখানে সে কী করছে জিজ্ঞাসা করায় ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেনি। বাড়িতে ফেরার পর সকলে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সে সারারাত কোথায় ছিল, তখন সে উত্তর দিয়েছিল যে সে উইলিয়মকে

খুঁজছিল। উইলিয়মের মৃতদেহ তাকে দেখানোমাত্র সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল এবং কয়দিন বিছানায় শুয়ে ছিল। তারপর সরকারি উকিল মীনে-করা একটি সোনার লকেট বের করে বললেন—এই সেই লকেট যেটি মৃত্যুর পূর্বে শিশুটির গলায় ছিল এবং মৃত্যুর পর এই মেয়েটির জামার পকেট থেকে পাওয়া যায়।

একথা শোনামাত্র আদালতের মধ্যে ধিক্কার-ধ্বনি শোনা গেল।

জাস্টিনকে তার উত্তর দিতে বলা হল। জাস্টিন বলতে লাগল—ভগবান জানেন যে আমি নির্দোষ। যে উইলিয়মকে আমি নিজের ছেলের মতো প্রতিপালন করেছি, তার একটি ছোট লকেটের লোভে আমি তাকে হত্যা করব—একথা সকলে বিশ্বাস করলেও ভগবান বিশ্বাস করবেন না।

একটু থেমে সে বলে যেতে লাগল যে হত্যাকাণ্ডের রাত্রে সে এলিজাবেথের অনুমতি নিয়েই জেনেভার কাছাকাছি সেনে গ্রামে তার মাসির বাড়িতে গেছিল। রাত ন'টার সময় ফেরার পথে একজন লোকের কাছে সে প্রথম সংবাদ পায় যে উইলিয়মকে পাওয়া যাচ্ছে না। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে সে অনেকক্ষণ ধরে চারদিক খোঁজ করে। যখন খেয়াল হল, তখন জেনেভা নগরীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটা পোড়ো ঘরে সে আশ্রয় নেয় এবং সারারাত সেখানেই থাকে। মনে হয়, সে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। কারুর পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায়নি। সকাল হলে সে বাড়ি ফিরে আসে। কেউ যদি তাকে হত্যাকাণ্ডের স্থানে দেখে থাকে, হয়তো সে যখন উইলিয়মকে খুঁজছিল তখন দেখেছে। যদি সে হত্যাকাণ্ডের স্থানে গিয়ে থাকে তবে সে নিজের অজান্তেই গেছে। লকেটের সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই।

তারপর উঠল এলিজাবেথ। সে বলল—আমি নিহত শিশু উইলিয়মের পরিবারে শিশুবয়স থেকে আছি। উইলিয়মের বাবা-মাকে নিজের বাপ-মায়ের মতো দেখেছি এবং তাঁদের কাছ থেকেও সেই ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আমি জাস্টিনকে অনেকদিন ধরে জানি, একই বাড়িতে আমরা প্রায় সাত বছর একত্রে বাস করেছি। তার মতো ভদ্র, অমায়িক ও স্নেহবৎসলা আমি খুব কম দেখেছি। মিসেস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের অসুখের সময় সে অত্যন্ত যত্ন এবং দায়িত্বের সঙ্গে তাঁর সেবা করেছে। এই পরিবারের প্রত্যেকেই তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসেন। যে শিশুর হত্যার অপরাধে জাস্টিন অভিযুক্ত হয়েছে তাকে সে নিজের ছেলের মতো এতদিন দেখেছে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও আমি তার সম্পূর্ণ নির্দোষিতায় বিশ্বাস করি। এই জঘন্য পাপকাজ করার মতো কোনো প্রবৃত্তি তার হতে পারে না, কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে সে এ-কাজ করতে পারে না। সে যদি চাইত তবে আমি সামান্য ওই লকেট কেন, আরো অনেক দামি জিনিস তাকে আনন্দে দিতাম—এতখানি আমি তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি।

এলিজাবেথের এই অকপট ও মর্মগ্রাহী আবেদনে সমস্ত আদালতের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই আলোড়ন শুধু এলিজাবেথের সুন্দর জবানিতে জাস্টিনের অপরাধ মার্জনার আবেদনের জন্য—

জাস্টিনের ওপর তাদের এতটুকু সহানুভূতি হল না। বরং ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মহানুভবতার প্রতিদানে এই জঘন্য অকৃতজ্ঞতায় সকলের মন তার ওপর বেশি বিরূপ হয়ে উঠল।

এলিজাবেথের কথা শুনতে শুনতে জাস্টিন কেঁদে ফেলেছিল, কিন্তু সে একটি কথাও বলেনি। বিচারের সবটুকু সময় ধরে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মনের মধ্যে যে তোলপাড় হচ্ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জাস্টিন যে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে-সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। তিনি একথা জানতেন। তবে কি সেই দৈত্য তার ভাইকে হত্যা করে পৈশাচিক উন্মত্ততায় এই নির্দোষ পরিচারিকার জামার পকেটে সেই লকেটটা রেখে গেছিল?

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল, তারপর দ্রুতগতিতে ঘুরতে লাগল। একটা অগ্নিবলয় সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে করতে আসছে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ, তারপর অন্ধকার... অন্ধকার, আর সেই কালিমার মধ্য থেকে একটি পৈশাচিক মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

সারা আদালতে তুমুল চাঞ্চল্য। জাস্টিন অপরাধ স্বীকার করেছে, বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

জাস্টিনকে প্রহরীরা নিয়ে যাচ্ছে। এলিজাবেথ ছুটে গেল, বলল—জাস্টিন, তুমি এ কী করলে? আমার শেষ সান্ত্বনাটুকুও তুমি কেড়ে নিলে? তুমি—তুমি উইলিয়মকে হত্যা করেছে?

জাস্টিন তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—এলিজা, তুমি কি আমাকে এত নীচ মনে করো? তুমি কি সত্যই মনে করতে পারো যে আমি উইলিয়মকে হত্যা করেছি? কিন্তু কী করব? মুক্তি পেলেও সকলের কাছে আমি ঘৃণ্য হয়ে থাকব, কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি নির্দোষ। আর তা ছাড়া উইলিয়মকে আমি নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছি। তাকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব? তার চেয়ে এই ভালো, স্বর্গে উইলিয়মের সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারব।

সাত

দৈত্যের আবির্ভাব

পর পর দ্রুতগতিতে কয়েকটি অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনের ফলে মানুষের অনুভূতি উত্তেজনার চরম শিখরে ওঠার পর যে নিষ্ক্রিয় জড়তা মৃত্যুর মতো সমস্ত দেহকে শীতল করে রাখে, তার চেয়ে বেদনাকর বোধহয় আর কিছুই নেই। মানুষ তখন আশা-ভরসা, জীবন-মৃত্যু, ভয়-ভাবনার অতীত। জাস্টিনের ফাঁসি হয়েছে, মৃত্যুর পরে সে শান্তি লাভ করেছে; কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আজও জীবিত, সমস্ত হৃদয় জুড়ে নৈরাশ্য আর বেদনা। তাঁর চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। এক লক্ষ্যহীন প্রেতাত্মার মতো তিনি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবর্ণনীয় বীভৎস অন্যায় তিনি করেছেন এবং সেই পাপের ফলে ভবিষ্যতে আরো কত বীভৎস ঘটনা ঘটবে। অতীতের দিকে তাকিয়ে তিনি কোথাও এতটুকু খুশির আলো দেখতে পেলেন না, ভবিষ্যতে কোনো আশার স্বাক্ষর নেই। তাঁর সমস্ত মন ধীরে ধীরে আত্মগ্রাসী বিমর্ষতায় অধিকার করল, নিজেকে মনে হল ঘৃণ্য অপরাধী—তারপর যে মানসিক অত্যাচার, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মানসিক এই অবস্থায় তাঁর শরীর ভেঙে গেল। বিজ্ঞান-সাধনার পুরস্কারের পরিবর্তে প্রথম রূঢ় আঘাতের পর থেকেই তিনি শারীরিক বিশেষ সুস্থ ছিলেন না। তিনি লোকের সঙ্গ এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কোথাও কোনো আনন্দ বা কারুর এতটুকু আত্মপ্রসাদ তাঁর কাছে নির্যাতন বলে মনে হত! নির্জনতা—গভীর, অন্ধকার—মৃত্যুর মতো নির্জনতা ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে পরে প্রায়ই গভীর রাত্রে তিনি নৌকো নিয়ে লেকে একা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো লেকের মাঝখানে এসে হাল তুলে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন—নৌকোটি নিজের খুশিমতো যেমন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা যাক। লেকের জলে তাঁর কুৎসিত ছায়া দেখে ভাবতেন যে এত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে শুধু গুটিকয় ব্যাঙ বা বাদুড় ছাড়া তাঁর মতো অস্থির, তাঁর মতো কুৎসিত আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছা হত যে শান্ত শীতল লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে; লেকের নির্মল জলে তাঁর সমস্ত ভয়, ভাবনা, দুঃখ, অশান্তির পরিসমাপ্তি এনে দিতে। কিন্তু তখনই মনে হত তাঁর বাড়ির লোকজনের কথা। নিজে আত্মরক্ষা করে আর সকলকে সেই শয়তানের নিষ্ঠুর হিংস্রতার মুখে ঠেলে দিয়ে যাবেন!

প্রতিদিন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন যে, যেন তাঁর মনে একবার শান্তি ফিরে আসে, যেন তিনি পরিবারের প্রত্যেককে সান্ত্বনা দিতে পারেন, সুখী করতে পারেন। কিন্তু তা হতে পারে না। মনস্তাপ সমস্ত আশা নির্মূল করে দিয়ে যায়! তিনি এক ঘৃণ্য পশু সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন তিনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন—আবার কখন সেই দৈত্যটি এমন এক নৃশংস কুকীর্তি করবে যা তার অতীতের সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে ছাপিয়ে যাবে। যতদিন তাঁর প্রিয়তমদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকবে ততদিন এই ভীতি থাকবেই। যখনই তার অপরাধ আর বিদ্বেষের কথা তাঁর মনে হত তখনই তার প্রতি ঘৃণায় আর তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিহিংসায় তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠত। যদি এন্ডিস্ পর্বতের সুউচ্চ চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব হত, তবে সেই দুর্গম পর্বতশিখরে ছুটে যেতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। মাঝে মাঝে তাকে সামনাসামনি পাওয়ার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠতেন, এতগুলো লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার শাস্তি কীভাবে তাকে দেওয়া যায়—তা কল্পনা করতে না পেরে আরো অস্থির হয়ে উঠতেন।

এলিজাবেথ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত, কিন্তু বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা, স্বর্গ বা মর্ত্যের সৌন্দর্য তাঁর আত্মাকে দুঃখের থেকে মুক্তি দিতে পারত না; বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, দয়া, মায়া, মমতা—তাঁর বিকল হৃদয়ের কাছে বিফল। তাঁকে ঘিরে যেন এক কালো মেঘ, যাকে ভেদ করে কোনোকিছু ভালো কাছে যেতে পারে না। একটি আহত হরিণ যেমন নিজের অসাড় দেহকে টানতে টানতে এক নির্জন স্থানে এনে তার দেহ-বিদ্ধ তীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে, তাঁরও ঠিক সেই একই অবস্থা।

এই রকম মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে একদিন তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। আল্পস্ পাহাড়ের উপর উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানসিক অবসাদকে নিমগ্ন করে দিতে চাইলেন তিনি। সামুনি উপত্যকার দিকে তিনি পা বাড়ালেন। সারভক্স উপত্যকার মতো সুন্দর না হলেও এই উপত্যকা অপূর্ব মহিমময়। উঁচু তুষারমণ্ডিত পর্বত দিয়ে এই উপত্যকার সীমারেখা আঁকা, কোথাও পাহাড়ের উপর বিধ্বস্ত দুর্গের চিহ্ন নেই। বিরাট হিমানীপ্রবাহের পতনের গুরুগম্ভীর শব্দ আর তার যাত্রাপথ ধরে শীতল ধোঁয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে রাখে। সব ছাপিয়ে সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ—একেশ্বরের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

বিমুগ্ধ নয়নে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সেই নৈসর্গিক শোভা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন দূর থেকে মানুষের চেহারার মতো কী একটা যেন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। বিপদসঙ্কুল বরফের চাঁইয়ের উপর দিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, যা যে-কোনো মানুষের পক্ষেই বিপজ্জনক। তাঁর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। যতই সেই মূর্তিটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে সে আর কেউ নয়, তাঁর সৃষ্ট সেই শয়তান। তার সঙ্গে চিরকালের মতো শেষ বোঝাপড়ার জন্য তিনি মনে-মনে তৈরি হলেন।

তিনি ছুটে গেলেন তার দিকে। চিৎকার করে উঠলেন—শয়তান! পিশাচ! তুই-ই আমার ছোটভাইকে খুন করেছিস! তোর জন্যই জাস্টিনের ফাঁসি হয়েছে। আমি তোকে কী করতে পারি জানিস? আবার তুই আমার সামনে এসেছিস? চলে যা, দূর হ—

সে দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক হয়ে। তারপর চলে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়াল। তিনি আবার বললেন—কোথায় যাচ্ছিস? আগে যাদের তুই খুন করেছিস, তাদের সকলকে ফিরিয়ে দিয়ে যা। নয়তো আমিই গড়েছি তোকে, আমিই আবার তোকে ভেঙে চুরমার করে দেব।

খানিকক্ষণ সে ব্যথিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার পীতাভ চোখদুটো তুলে ধরল। বলল—যতখানি ব্যথা দেবে ভেবেছিলে, ততখানি পাইনি। আমি তোমার কাছে অনেকটা এইরকম ব্যবহার আশা করেছিলাম, ঠিক তাই-ই পেয়েছি। কিন্তু কেন আমাকে ঘৃণা করো?—কেন আমাকে হত্যা করতে চাও?

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের চোখদুটো অসহ্য রাগে জ্বলে উঠল, বললেন—কেন হত্যা করতে চাই! আমি তোকে সৃষ্টি করেছিলাম অতিমানুষ করার জন্য, কিন্তু তুই অমানুষ হলি। তারপর তুই যথেচ্ছাচার করে চলেছিস। মানুষের রক্তে সারা পৃথিবী রাঙিয়ে দিয়ে তোর তৃপ্তি হল না, তার ওপর আমারই ছোটভাইকে হত্যা করেছিস? আমি তোর সৃষ্টিকর্তা—আর আমারই সংসারে তুই মৃত্যুর কালিমা এনে দিয়েছিস!

দৈত্যের চোখ বোধ হয় ছলছল করে উঠল, বলল—তোমার ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না আমার। সত্যি বলছি, হে আমার ভগবান, আমায় বিশ্বাস করো। সব ঘটনাই তোমাকে একে একে বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি আমায় ক্ষমা করো। বলো ক্ষমা করলে!

তিনি বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলেন—ক্ষমা! বলতে লজ্জা করে না? তুই এমন এক সৃষ্টি—যে চারদিকে অশান্তি আনছে। যার নিছক আনন্দ হচ্ছে লোককে খুন করা। তুই আমার চোখের ঘুম নিয়েছিস, মুখের হাসি নিয়েছিস, মনের শান্তি নিয়েছিস—তোকে ক্ষমা করব? শয়তান!

এবারে দৈত্যটি যেন সত্যিই কেঁদে ফেলল, বলল—আমি জানি, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখময় কাহিনী শুনলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। তুমি আমার স্রষ্টা, কিন্তু তুমিই আমার সমস্ত দুঃখের কারণ। তাই আজ তোমাকেই আমি শুধু বলতে চাই, কেন আমি হিংসাবৃত্তি নিলাম। তুমি ততটুকু শুধু ধৈর্য ধর। তারপর তোমার যা খুশি তাই করো। শুধু আজ আমার একটু কথা শোনো—

আট

দৈত্যের কাহিনী

দৈত্যটি বলতে লাগল :

আমার জন্মকাহিনী তুমি তো আমার চেয়েও ভালো জানো, আমারই স্পষ্ট মনে নেই। ইচ্ছা হয়, কেন তুমি আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে আনলে তা জানতে। মৃত্যুর নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমি নিমগ্ন ছিলাম। পৃথিবীর এত রূপ, এত সৌন্দর্য, এত আলো, এত হাসি—সব আমার চোখ থেকে চিরকালের জন্য দূর হয়ে গেছিল, কিন্তু হে আমার স্রষ্টা, হে আমার পিতা—তুমি আবার আমাকে নতুন করে জীবন দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীতে নিয়ে এলে। আমার এ আনন্দের কথা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। হে স্রষ্টা, তাই তোমাকে আমি আমার প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। হে আমার দেবতা, আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

হঠাৎ যেন লক্ষ লক্ষ বছরের ঘুম থেকে আমি জেগে উঠলাম। আলো দেখলাম। এই সুন্দর পৃথিবীকে যতই আমি দেখতে লাগলাম ততই আমার ভালো লাগল। সবই স্বপ্নের মতো সুন্দর—কত সুন্দর! কত ভালো লাগল—তাই মনের আনন্দে কথা বলতে চাইলাম। গলার ভিতর শুধু ঘড়ঘড় করে উঠল। কিছুই বলতে পারলাম না। তোমাকে দেখেই বুঝলাম, তুমিই আমার স্রষ্টা। তোমার চোখমুখ সবই তা জানাচ্ছিল।

ইচ্ছা করছিল লাফিয়ে, হেঁটে, চলে এবং কথা বলে আমার আনন্দ প্রকাশ করি। কিন্তু তখনো সে শক্তি আমার হয়নি, তাই ব্যথায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম।

তারপর পেলাম আমার শক্তি। ভালো করে দেখলাম তোমাকে! তোমাকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগল। কিন্তু দেখলাম, তোমার সমস্ত মুখ কেমন বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। আমার দিকে বিজাতীয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তুমি ছুটে চলে গেলে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু বুঝলাম না কেন—কীজন্য তুমি আমায় ফেলে চলে গেলে।

মনে হল, তোমাকে আমার অনেক কথা বলা উচিত—অনেক কথা। তুমি আমার স্রষ্টা, আমার ভাগ্যবিধাতা, তোমার সঙ্গে কথা বলব না তো কার সঙ্গে বলব? তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব না তো কাকে জানাব? গেলাম তোমার শোয়ার ঘরে। তোমার মশারি তুলে কথা বলতে গেলাম, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর শুনে

নিজেই চমকে উঠলাম, দেখলাম—তুমি অসহনীয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলে।

মনের দুঃখে ঘরে ফিরে এলাম। কেন এই ঘৃণা! কেন? কেন? আমি কী করেছি? যদি ভালোবাসতেই না পারলে—যদি ঘৃণাই করবে, তবে হে বিধাতা, আমাকে জীবন দিলে কেন? যদি জীবনই দিলে তবে ভালোবাসবে না কেন? আমি তো তোমার কাছে জীবন চাইনি, তুমি তো স্বেচ্ছায় আমাকে সৃষ্টি করেছ। তবে আমার কিসের অপরাধ?

সমস্ত রাত একক নিঃসঙ্গতায়, প্রভু, তোমার কথাই ভেবেছি। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে দিনের আলোয় অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি তোমার ঘৃণাও দূর হয়ে যাবে। আমাকে তুমি তোমার সন্তানের মতো বুকে তুলে নেবে।

হায়রে আশা ছলনাময়ী। সকাল হল, আকাশ রাঙিয়ে সূর্যদেব আকাশে উঠলেন—তুমি এলে না আমার খোঁজ নিতে। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে উৎসুক হয়ে মুখ বের করে দেখতে গেলাম—তুমি কি না! কিন্তু যাকে দেখলাম সে আমাকে দেখে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে ঘৃণা, আতঙ্ক ফুটে উঠল এবং পরমুহূর্তে সে পাগলের মতো ছুটে পালাল। আমারও তো প্রাণ আছে, আমারও তো চেতনা আছে। সমস্ত শরীর রাগে কাঁপতে লাগল—আমায় দেখে ঘৃণা! এত ঘৃণ্য আমি? এত কুৎসিত দেখতে আমাকে? আমি তো ভালোই হতে চেয়েছি, আমি তো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি।

তারপর—মনে করে দেখ প্রভু, তোমরা সকলে মিলে আমার ওপর কী অকথ্য ও দুঃসহ অত্যাচার করেছ। চেয়ার দিয়ে আঘাত করেছ, কুকুর লাগিয়ে আহত করতে চেয়েছ, চাবুকে আমায় জর্জরিত করেছ, আগুন দিয়ে সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়েছ—কী দিয়ে তোমরা আমাকে শাসন করতে বাকি রেখেছ? নৃশংস অত্যাচারে আমার মতো নিঃসহায় এক নতুন জীবকে তোমরা নবজন্মের প্রথম প্রভাতেই দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিলে। অজস্র অত্যাচারে আমাকে বারবার অজ্ঞান করেও তোমাদের আশা মেটেনি, তার ওপর আবার অনাহারে রেখেছিলে—একফোঁটা জলও পিপাসা মেটাতে দাওনি। প্রাণধারণের চেষ্টায় তাই তো আমাকে প্রথম মানুষ হত্যা করতে হয়! কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রভু, আমি তা চাইনি। তোমরাই চেয়েছিলে আমাকে হত্যা করতে। আমি আত্মরক্ষা করেছি মাত্র। যখন আমাকে অস্ত্রোপচার করতে উদ্যত হলে তখন আমার ভয় হল। মনে হল—তোমরা আমাকে বাঁচতে দেবে না, অথচ আমি যে বাঁচতে চাই। এত সুন্দর পৃথিবী আমি প্রাণভরে দেখতে চাই। তাই শুধু আত্মরক্ষার জন্য তোমার সঙ্গীকে আমি হত্যা করেছি। নয়তো সত্যি বলছি, হত্যা করতে আমার নিজের কোনো ইচ্ছা ছিল না। হিংসাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণাই করি।

তারপর ভয় হল, হয়তো আবার আমাকে শাসন করবে, অনিচ্ছাকৃত এই কুকীর্তির জন্য তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করবে। তাই পালালাম ওখান থেকে।

কয়েকদিন বনে বনে থেকে পৃথিবীতে বাঁচার সমস্ত উপায় প্রায় জেনে নিলাম। অনেক চেষ্টা করে কথা কইতেও শিখলাম।

মনে হল, তোমরা তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে, দেখি—পৃথিবীর সব লোকই তোমাদের মতো কি না, কেউ আমাকে ভালোবাসে কি না। তাই আবার লোকালয়ে ফিরে এলাম।

একদিন খুব ভোরবেলা। তখনো কুয়াশা প্রায় সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করে আছে। আমি একটি ছোট্ট বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক আর একটি ছোট মেয়ে। ভদ্রলোকটি বাইরে চলে গেলেন আর ছোট্ট মেয়েটি গেল সামনে দিঘির ধারে। আমার মনে হল, এই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করি। গেলাম তার কাছে। তখনো কুয়াশায় আমাকে স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটির কাছে গিয়ে বললাম—খুকু, আমি তোমার সঙ্গে খেলতে চাই।

মেয়েটি বলল—বেশ তো, ওই ফুলগুলো পেড়ে দাও। তারপর আমরা ফুলগুলো জলে ভাসাব।

মনটা আনন্দে ভরে উঠল। এই মেয়েটি তবে আমায় ঘৃণা করে না। গাছের সমস্ত ফুল পেড়ে আমরা খেলতে শুরু করলাম। খেলতে খেলতে বেশ বেলা হয়ে এল। তখন আঁধার কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠেছে। হঠাৎ মেয়েটির চোখ পড়ল আমার ওপর।

ভয়ে মেয়েটি পাংশু হয়ে গেল। চিৎকার করে পালাতে গেল। আমি তাকে ধরে বলতে গেলাম, 'খুকু, ভয় নেই, আমি ভূত নই।' কিন্তু হয়তো—হয়তো তার গলায় একটু জোরে চাপ পড়েছিল, তাই মেয়েটি মারা গেল। বিশ্বাস করো, আমার ভগবান, বিশ্বাস করো ওই ফুলের মতো ছোট্ট মেয়েটিকে আমি মারতে চাইনি। ওই মেয়েটিই তো প্রথম ভালোবেসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, খেলা করেছে।

নিজের শক্তির ওপর এক অবিশ্বাস, এক নিদারুণ ভয় এসে গেল। মনে হল আমার অপরিসীম শক্তিই আমার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সখ্য'র প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটুকু আমি বুঝতে পারলাম যে ইচ্ছা করলে আমার শক্তি দিয়ে মানুষের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার স্থাপন করতে পারি; কিন্তু আমি তো তা চাই না। আমি চাই সকলের মতো সকলের সঙ্গে মিশতে—এই সুন্দর পৃথিবীর সবটুকু আনন্দ সকলের সঙ্গে সমানভাবে উপভোগ করতে।

তাই লোকালয় থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম। অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে বনের অন্ধকারে নিজের মুখ লুকোতে চাইলাম। কিন্তু হে আমার স্রষ্টা, তা পারলাম না। এই শীত, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সবকিছুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকলের মতো আমারও তো আশ্রয় চাই। সকলের মতো আমারও তো আহার চাই।

ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামের দূর কোণে একটি পোড়োবাড়ি পেলাম। কাছেই বন। আমার বাড়ির সামনে শুধু ছোট একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধ, আর স্বামী-স্ত্রী থাকে। আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতাম, আর গভীর রাত্রে বনে গিয়ে ফলমূল সংগ্রহ করে আনতাম।



আমার ঘরের জানলার ছিদ্র দিয়ে সামনের বাড়ির লোকদের দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। দেখতাম, প্রতিদিন সকালে লোকটি হাতে একটি কুড়োল নিয়ে চলে যেত। সন্ধ্যাবেলায় সে একবোঝা কাঠ নিয়ে আসত। মেয়েটি তার খাবার এনে দিয়ে গল্প করত। দুপুরবেলায় মেয়েটি বৃদ্ধ লোকটিকে বাইরে রোদে বসিয়ে দিয়ে যেত, আবার বিকেলবেলায় তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে যেত। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যাবেলায় ছেলেটি আর মেয়েটি হাত-ধরাধরি করে বেড়াতে যেত। বৃদ্ধ লোকটিকে সব সময়েই দেখতাম একা বসে।

বৃদ্ধের জন্য আমার কষ্ট হত। বেশ বুঝতাম, তিনি ঠিক আমার মতোই নিঃসঙ্গ। প্রতিদিন স্থির করতাম, বাড়িতে কেউ যখন থাকবে না তখন আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করব। কিন্তু সাহস হত না।

সেই ছেলেটির জন্যও মনে-মনে দুঃখ হত। সারাদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সামান্য কাঠ সে মাত্র সংগ্রহ করে, অথচ আমার শক্তি দিয়ে সেই কাঠ আমি একটু সময়ে এনে দিতে পারি। তাই একদিন গভীর রাতে ছেলেটির কুড়োল নিয়ে কাঠ কেটে এনে তার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে সেই ছেলেটি ও মেয়েটি বাড়ির সামনে স্তূপাকার কাঠ দেখে চমকে উঠেছিল। সেদিন আর সে বনে যায়নি, বাগানেই কাজ করেছিল। এরপর থেকে প্রতিদিন রাতে আমি তাদের কাঠ কেটে এনে দিতাম।

ধীরে ধীরে ওই পরিবারের ওপর আমার মমতা জন্মাতে লাগল। একদিন ছেলেটি ও মেয়েটি বাইরে চলে গেলে পর আমি সেই বৃদ্ধের কাছে গেলাম, তাঁর সঙ্গে অনেক কথা বললাম। দেখলাম, তিনি চোখে দেখতে পান না। সেদিন আনন্দে আমার মন ভরে উঠল।

তারপর সেই ছেলেমেয়ের অনুপস্থিতিতে প্রতিদিন আমি সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতাম। বৃদ্ধও আমার সঙ্গে কথা বলে খুশি হতেন।

একদিন রাতে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, হঠাৎ সেই ছেলে ও মেয়েটি ফিরে এল। মেয়েটি আমাকে দেখেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

বৃদ্ধ বললেন—কী হয়েছে? ইনিই তো সেই ভদ্রলোক যাঁর কথা তোমাদের কাছে বলেছি।

সেই লোকটি একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে টেনে সরিয়ে নিল। তারপর লাঠি দিয়ে আমাকে আঘাত করল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক চিৎকার করতে লাগলেন—তোরা কি পাগল হলি? এ ভদ্রলোককে তোরা মারধোর করছিস্ কেন?

আমি জানতাম, সেই ভদ্রলোকটিকে আমি ইচ্ছা করলেই টেনে ছিঁড়ে মেরে ফেলতে পারি; কিন্তু মনে পড়ল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা! আমাকে তিনি 'ভদ্রলোক' বলেছেন, ভদ্র ব্যবহার করাই আমার উচিত। কোনো কথা না বলে আমি সমস্ত অপমান সহ্য করে ফিরে এলাম। বুঝতে পারলাম না—কী আমার এমন অপরাধ যে লোকে আমাকে ঘৃণা করে!

তারপর একদিন এক নদীর জলে আমার পৈশাচিক মূর্তি দেখে নিজেই শিউরে উঠলাম। মনে হল কেউ তো আমাকে ভালোবাসবে না। এই কুৎসিত মুখ, এই কুৎসিত দেহ—কেউ সহ্য করতে পারবে না। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। এই জীবনকে আমি বড় ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তাই বাঁচতে চাই, আমি ভালোবাসা চাই।

কিন্তু এই কুৎসিত কদাকার ভীষণ মূর্তি দেখে কেউ ভালোবাসে না, কেউ কাছে আসতে চায় না—দূরে সরে যায়। আমি একলা, একেবারে নিঃসঙ্গ। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, কিন্তু রূপ দিলে না কেন? কেন আমায় এত কুৎসিত করে গড়ে তুললে? আর তোমার সৃষ্টিকে কেন তুমি ভালোবাসতে পারলে না?

প্রাণ দিলে, রূপ দিলে না। প্রাণ দিলে, সঙ্গী দিলে না। এই বিরাট পৃথিবীতে সকলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ করছে—আমি শুধু একা আমার দুঃখের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কি বুঝতে পারো না যে, তুমিই তোমার সৃষ্টির ওপর মর্মান্তিক অবিচার করেছ?

তুমি কি জানো না যে, একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কতদূর অসহ্য। এই জীবন এখন এত দুর্বহ হয়ে উঠেছে যে, এক এক সময় ভাবি আত্মহত্যা করে সমস্ত জ্বালা জুড়োই। কিন্তু পারি কই? চোখে পড়ে এই পৃথিবীর আলো-বাতাস, গাছপালা, আর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য! আর অনুভব করি আমার এই কুৎসিত দেহের মধ্যেকার সুন্দর প্রাণটিকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি।

তাই আর আমার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব হল না! ভাবলাম—এই পৃথিবীর ওপর, জাগতিক সমস্ত সৌন্দর্যের ওপর প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধের জন্য আমি বদ্ধপরিকর হলাম। বললাম—হে স্রষ্টা, তুমি আমাকে কুরূপ দিয়েছ, তুমি আমাকে নিঃসঙ্গ করে রেখেছ, আমিও লোকের জীবন সেইরকম নিঃসঙ্গ আর যন্ত্রণাময় করে তুলব। আমি তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকে মরণের পরপারে পাঠিয়ে তাদের সমস্ত সুখ-আহ্লাদ চিরকালের জন্য দূর করে দেব। তাদের ঘৃণা আর আমার হত্যা—এই দুই একসঙ্গে সমান্তরালভাবে চলবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি। কত লোক যে হত্যা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু দেখছি প্রতিহিংসায় মনে শান্তি পাই না। তুমি আমার ভগবান, আমার জীবনদাতা, আমার প্রভু, আমার স্রষ্টা—তাই তোমার কাছে আমি ফিরে এসেছি। তুমি আমার দিকে মুখ তুলে চাও। তোমার সৃষ্টির ওপর এই অসঙ্গত ব্যবহার তোমার শোভা পায় না। মানুষের সমস্ত অন্যায় যখন ভগবান ক্ষমা করেন, তখন তুমি আমার স্রষ্টা হয়ে কেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবে না? যখন জীবনই দিলে সুখ এনে দাও, শান্তি এনে দাও।

তোমার ভাইকে হত্যা করেছি বলে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। কিন্তু সে দোষ কি আমার? তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমিও কি দুঃখ পাইনি? আমি তো তাকে মারতে চাইনি, আমি তাকে ভালোবাসতেই চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সে ছোট ছেলে, হয়তো সে আমায় ঘৃণা করবে না—হয়তো আমাকে তার সঙ্গী করে নেবে।

আমার স্রষ্টার ভাই সে, কত আশা করে তার কাছে গেছিলাম, কিন্তু সে-ও ঠিক তোমার মতো ভয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। সে জোর করে আমার কাছে থেকে চলে যেতে চাইল।

তখন আমার ভয়ানক রাগ হল। ভাবলাম, যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আমার এই দুর্দশা এই দুরদৃষ্টের জন্য দায়ী, তারও কোনো সঙ্গী রাখব না। তাই তোমার ভাইকে হত্যা করলাম। আর একটি স্ত্রীলোক—তোমাদের কেউ হবে—সে-ও একদিন আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিল। তাকে শাস্তি দেব ঠিক করেছিলাম। তাই সে যখন নগরের বাইরে একটি ঘরে একা নিদ্রামগ্ন তখন তার পোশাকের মধ্যে রেখেছিলাম তোমার মৃত ভাইয়ের সোনার লকেট। পুলিশ তাকে হত্যাকারী বলে ধরে নিয়ে ফাঁসি দিয়েছে।

শোনো আমার কথা..

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আর শুনতে পারলেন না। রাগে, ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। এই পিশাচটি শুধু তাঁর ভাইকে হত্যা করেই তৃপ্ত হয়নি, হত্যার অপরাধ তুলে দিয়েছে উইলিয়মের পরিচারিকা জাস্টিনের ঘাড়ে। এতদিন তাঁর যা শুধু মনের ধারণা ছিল, আজ সেকথা সত্য প্রমাণিত হল। যদি একথা সে অস্বীকার করত, তবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও তবু তাঁর সান্ত্বনা একটু থাকত—হয়তো দৈত্যটি সত্যকথা বলছে! তবে জাস্টিনের মৃত্যুর জন্য তিনিও দায়ী হতেন না। কিন্তু আজ তিনি সত্য সত্যই নিরপরাধ জাস্টিনের হত্যাকারী।

আর সহ্য করতে পারলেন না, চিৎকার করে উঠলেন তিনি—না—না, তোর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার সম্মুখ থেকে তুই দূর হয়ে যা।

পিছন ফিরে তিনি পা বাড়ালেন।

পিছন থেকে আকুতি শোনা গেল—শোনো, আমার সব কথা শুনে যাও..

কিন্তু তিনি আর শুনলেন না। এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে ছলছল কণ্ঠে কয়েকটি কথা শোনা গেল: —চলে গেলে। বেশ, তবু আমি আশা ছাড়ব না। তুমি যেখানে যাবে সেখানে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ; আমি জানি তুমি আমাকে দুঃখ দিতে পারবে না—আমার কথা ফেলতে পারবে না।

নয়

পৈশাচিক প্রতিহিংসা

দানবের কথায় তাঁর যেমন ভয়ও হল, মানসিক অশান্তিও তত বেড়ে গেল। এইরকম মানসিক অবস্থায় বেড়িয়ে ফিরতেও ভালো লাগে না। তাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আবার জেনেভায় ফিরে এলেন। এলিজাবেথ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই।

কিছুই ভালো লাগছে না তাঁর। শুধু থেকে-থেকে মনে হয় সেই দানবের কথা। সে আবার দেখা করবে বলেছে। ওই দানবটির হাত থেকে পরিত্রাণের কী উপায় থাকতে পারে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর এলিজাবেথের সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছেন তিনি, মনে হল পিছন পিছন কে যেন আসছে! চমকে পিছন ফিরলেন, দূর অন্ধকারে একটা কালো বিদ্যুৎ যেন চকিতে মিলিয়ে গেল। তাঁর ভয় হল। এই বীভৎস দানবটির অস্তিত্বের কথা তিনি এলিজাবেথের কাছে গোপন রাখতে চাইলেন। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালেন।

এইভাবে তাঁর দিন কাটে। বুঝতে পারেন সেই দৈত্যটি তাঁর কাছেই ঘুরছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কেউ থাকার জন্য সামনে আসছে না। একদিন তিনি একা একা ক্লেরভালের বাড়ি থেকে ফিরছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন তাঁর হাত চেপে ধরল। এরকমই তিনি আশা করছিলেন, তবু চমকে উঠলেন। যা ভেবেছিলেন তাই; বললেন—আবার কী চাই তোর?

দৈত্যটি বলল—বলেছিলাম আবার আসব, তাই এসেছি। আজ আমার সব কথা শুনতে হবে।

একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দৈত্যটি বলল—হে আমার প্রভু, আমি একজন সঙ্গী চাই, আমি চাই ভালোবাসা। আমি জানি কোনো মানুষই আমার সঙ্গে মিশবে না। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছে, আমার মতো আর একটি কদাকার কুৎসিত দানব সৃষ্টি করো—সে আমার সঙ্গী হবে। সে আমাকে ঘৃণা করবে না। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব। এই দুর্বহ জীবনে তবেই পাব শান্তি।

তিনি প্রশ্ন করলেন—তোকে বিশ্বাস কী? যদি দলে ভারী হয়ে তোরা আরো বেশি অত্যাচার করিস? দৈত্যটি বলল—কেন অবিশ্বাস করছ প্রভু? বলেছি তো

আমি হত্যা করেছি সঙ্গী পাইনি বলে—ভালোবাসা পাইনি বলে। যদি সঙ্গী পাই, তবে তোমাদের এই লোকালয় ত্যাগ করে আমরা অনেক দূরে চলে যাব—আর আসব না এখানে মানুষের ঘৃণা কুড়োতে।

তিনি বললেন—তোকে সৃষ্টি করেই আমি জগতের সবচেয়ে বেশি অপকার করেছি। আর আমার পাপ বাড়াতে পারি না। আমি আর কিছু করতে পারব না।

দৈত্যটি বলল—এই তোমার শেষ কথা! বেশ, তবে তোমাকেও শান্তিতে থাকতে দেব না। আগে তোমার সমস্ত আত্মীয়, তারপর একে একে আর্নেস্টি, তোমার বাবা, এলিজাবেথ, বন্ধু ক্লেরভাল—সকলকে হত্যা করব। তুমি দেখবে এক-একদিন কেমন করে এক-একজন তোমার চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। তখন তুমি খুব শান্তিতে থাকবে। নিঃসঙ্গ জীবন যখন তোমাকে পাগল করে তুলবে, যখন তোমার জীবন আমার জীবনের মতো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, তখন বুঝবে নিঃসঙ্গ জীবনে কত আনন্দ, তখন তুমি আমাকে ভালোবাসবে। আমার সঙ্গী হবে।

বড় ভয় হল তাঁর। নিজের প্রাণের ভয়ে নয়—তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জীবন-সংশয়ে ভীত হয়ে তিনি আর একটি জীব সৃষ্টি করতে সম্মত হলেন। বললেন—বেশ, আমি এটি তৈরি করে দেব। কিন্তু তোর প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে তোর সঙ্গী পেলেই তোরা লোকালয় ছেড়ে দূরদেশে চলে যাবি। আর কোনোদিন এদেশে ফিরে আসবি না। আর নরহত্যাও করতে পারবি না।

দৈত্যটি বলল—তাই হবে প্রভু!

তিনি বললেন—বেশ! তবে কালই আমি আবার ল্যাবরেটরিতে ফিরে যাব।

বাড়িতে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন জানালেন যে পরদিনই তাঁকে ফিরতে হবে ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কাজে। মাত্র কয়েকদিন—তারপর ফিরে এসে তিনি এলিজাবেথকে বিবাহ করবেন।

তারপর আবার সেই আগের মতো পাহাড়প্রমাণ অস্থি সংগ্রহ, আর জোড়াতালি দিয়ে মনুষ্যাকৃতি গড়া। কিন্তু এবার আর আগেকার মতো উৎসাহ নেই। সব সময়ে মনে ভয় হয়; ভয় কেন—তিনি স্থিরই জানেন এবারেও যাকে তিনি সৃষ্টি করবেন, সে মানুষ হবে না। সে হবে ঠিক আগেকার মতোই এক অতি কুৎসিত ও কদাকার দানব।

বেশ জানেন তাঁর ওপর লক্ষ রেখেছে সেই দৈত্যটা। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই তার অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেন। মাঝে মাঝে শার্সিতে তার ছায়া দেখতে পান, আর তাঁর সমস্ত অঙ্গ বিকল হয়ে আসে। শুধু প্রাণের ভয়েই তার আদেশ পালন করছেন তিনি! তাঁরই সৃষ্টির ক্রীড়নক আজ তিনি ! ভাগ্যের এতদূর পরিহাস!

মাঝে মাঝে ভাবেন, এ কী সর্বনাশ করতে চলেছেন তিনি। একটি দানবকে নিয়েই এত অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, আর একটি হলে তো সমস্ত পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। না—আর তিনি এ-কাজ করতে পারবেন না।

আবার মাঝে মাঝে মনে পড়ে সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বাবা, আর্নেস্ট, ক্লেরভাল আর এলিজাবেথের মুখ। দৈত্যটি শাসিয়ে গেছে যে, তার সঙ্গী না করে দিলে আর কারুর নিস্তার নেই। একদিকে এত আত্মীয়, প্রিয়জন—আর একদিকে আর এক দানব সৃষ্টি।

দেখেন, যতই নতুন দৈত্যটির রূপ-সৃষ্টি অগ্রসর হচ্ছে ততই সেই দৈত্যটির চোখমুখ ঝলমল করছে, সারা দেহে যেন আনন্দ উথলে পড়ছে। তবে কি দৈত্যটি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? একটি সঙ্গী পেলে এতদিনের সমস্ত ঘৃণার প্রতিহিংসা নেবে মানুষের ওপর?

কাজে বাধা পড়ে। আর কাজ করতে তাঁর মন বসে না। তিনি কী করবেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। তারপর হঠাৎ মনে হল দানবের কথার কোনো দাম নেই। জগতের যে সর্বনাশ তিনি করেছেন তা-ই পূর্ণ করতে পারবেন না কোনোদিন—মিছে আর কেন ধ্বংস ডেকে আনা?

মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আর তিনি ভাবতে পারেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই আধা-গড়া মনুষ্যমূর্তিটির দিকে, তারপর তাকে আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেললেন। শব্দ শুনে দৌড়ে এল দৈত্যটি। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই ভাঙা অস্থিপঞ্জরের দিকে! চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল টলটল করে উঠল।

করুণ আর্তনাদে ভেঙে পড়ে বলল—ভেঙে ফেললে! তবে তুমি কি আমাকে একটি সঙ্গী তৈরি করে দেবে না!

তিনি চিৎকার করে উঠলেন—না, না দেব না। তোকে সৃষ্টি করেই আমি জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ কুড়িয়েছি, আর নয়। এবার দূর হ!

চোখদুটো তার জ্বলে উঠল। বলল—দূর হব? বেশ দূরই হব! এতদিনেও যে তোমার শিক্ষা হয়নি তা বেশ বুঝতে পারছি। ধ্বংসের কথা বলছিলে, অভিশাপের কথা বলছিলে? এতদিন তো তুমি ধ্বংস কাকে বলে দেখতে পাওনি। এইবারে তাই দেখবে। দেখব সুখী হও কিনা। যাবার আগে বলে যাচ্ছি যে কাল থেকে মানুষের কান্নায় সারা পৃথিবী ভরে উঠবে। আর তার জন্য একমাত্র দায়ী তুমি! হে ভগবান, তুমি—তুমি—

কিছুদূর চলে গেল সে। সেখান থেকে চিৎকার করে বলল—আমাকে নিঃসঙ্গ করে তুমি সুখে ঘর বাঁধবে? বেশ! তোমার বিয়ের রাতে আবার আমার দেখা পাবে। প্রস্তুত থেকো, প্রভু, সেই রাতের জন্য প্রস্তুত থেকো।

অত্যন্ত অসুস্থ দেহ মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। সকলে সশঙ্ক হয়ে উঠল। এ কী হয়েছে তাঁর চেহারার? কারো সঙ্গে আলাপ করতেও তাঁর ভালো লাগে না।

কিন্তু দিন কেটে যায়। আর প্রতিদিনই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ভৌতিক মৃত্যুকাহিনীর খবর পান। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে আসামিদের। তিনিই শুধু জানেন এই হত্যাকারী কে। অথচ তাঁদের এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না; কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না।

তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রতিদিন বন্দুক হাতে বের হন সেই দানবটির সন্ধানে। এতদিন যা পারেননি এবার তা-ই করবেন। দেখা পেলেই আর কথা নয়...অব্যর্থ সন্ধানে দানবটিকে ভূপাতিত করবেন।

সে নিশ্চয়ই তাঁর ওপর লক্ষ রাখে। কারণ তিনি যেদিন যেদিকে দানবটির খোঁজে বের হন, ঠিক তার বিপরীত দিকে সেদিন হত্যাকাণ্ড চলে।

এলিজাবেথকে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন—আমি জানি কে এই হত্যা করছে।

এলিজাবেথের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল—কে?

সেকথা আপাতত গোপন থাক। তবে সে মানুষ নয়।—বললেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।

এলিজাবেথ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল—তুমি অসুস্থ। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।

এদিকে বিবাহের দিন ঘনিয়ে আসে; তবু তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। এখন অবশ্য আর হত্যাকাহিনী শোনা যাচ্ছে না। তবে কি সে এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে? সে কি সত্যিই বুঝেছে যে প্রতিহিংসা দিয়ে শান্তি আসে না?

বিবাহের দিন হঠাৎ তাঁর মনে হল—আজই তো তার দর্শন দেবার কথা। তিনি রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

ক্লেরভালের সঙ্গে তাঁর গল্প করতে ভালো লাগছিল না। মাঝে মাঝে চমকিয়ে ওঠেন। ক্লেরভাল জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

কিছুই হয়নি—উত্তর করেন তিনি।

বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হল। শেষ হল সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিদায় জানিয়ে অতিথিরা চলে গেলেন একে একে। এলিজাবেথ চলে গেল তার নিজের ঘরে।

ক্লেরভালের সঙ্গে নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ তাঁর কানে ভেসে এল। পরমুহূর্তে কয়েকজনের ছুটে আসার শব্দ, কতগুলো আর্তনাদ—এই বিশৃঙ্খলা! একমুহূর্তের জন্য তিনি বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, তারপর ক্লেরভালের হাত ধরে ছুটে গেলেন বাড়ির ভেতরে।

সিঁড়ির ওপরে পড়ে আছে তাঁর বাবার মৃতদেহ। গলাটি কে যেন মুচড়িয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে। এলিজাবেথের ঘরে গিয়ে দেখেন এলিজাবেথের সুন্দর ফুলের মতো দেহ অসাড় হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে।

আর দাঁড়াতে পারলেন না, ঐ দৃশ্য দেখতেও ইচ্ছা করে না। টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর্নেস্টের ঘরে গিয়ে দেখলেন ঠিক সেই অবস্থা। আর্নেস্টের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে তার বিছানায়।

সেখানেই বসে পড়লেন তিনি।

জানলার পাশ থেকে একটি অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল—তোমার সঙ্গীও এখন আর কেউ রইল না। এবারে তুমি বুঝবে নিঃসঙ্গ জীবন কেমন আনন্দের! প্রভু, এবার তুমি আর আমি একা!

উঠতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। তাঁর জ্ঞানহীন দেহ সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

দশ

সব শেষ

অত্যন্ত দুর্বলতা ও ক্লান্তির মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। মনে হল কী যেন হারিয়েছে, আর কী যেন তিনি ভুলে গেছেন। একটু ভাবতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

হঠাৎ শুনলেন কে যেন বলছে—হে আমার প্রভু, এবারে তুমি আর আমি একা। তোমার জীবন দিয়ে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সুখ অনুভব করো।

তারপর শার্সিতে দেখা গেল একটি কদাকার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল সমস্ত কথা। ওই দানবটি আজ রাত্রে আর একটু আগে তাঁদের বাড়িতে এক প্রলয়কাণ্ড বাধিয়েছে। নিমেষের মধ্যে হত্যা করেছে এলিজাবেথ, আর্নেস্ট আর তাঁর বাবাকে—

তিনি কম্পিত হাতে বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি ছুড়লেন।

ততক্ষণে সেই দানবটি অশরীরী ছায়ার মতো সাদা বরফের পাহাড়ের মধ্যে মিশে গেছে, কিন্তু দূর থেকে তার অট্টহাসি তখনো শোনা যাচ্ছিল।

বন্দুকের শব্দে ছুটে এলেন ক্লেরভাল। বললেন—কী হয়েছে বন্ধু?

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বললেন—বন্ধু, আজ আমি তোমাকে সব কথা বলব। কিন্তু বলো—অবিশ্বাস করবে না?

ক্লেরভাল বললেন—অবিশ্বাস করব তোমাকে!

তিনি বললেন—হ্যাঁ বন্ধু। আমার কাহিনী শুনলে তুমি আমাকে পাগল ভাববে। আর বলবে, এতগুলো শোকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ক্লেরভাল তাঁর বেদনার্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—না বন্ধু, তোমাকে অবিশ্বাস করব না।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তখন বললেন—তবে শোনো। আমার গবেষণার বিষয় ছিল সাধারণ লোকের কাছে অবিশ্বাস্য, এমনকি বৈজ্ঞানিকদের কাছেও অসম্ভব কল্পনার মতো। আমার গবেষণার বিষয় ছিল মৃতদেহে প্রাণ দান করা, তাকে অতিমানুষে রূপায়িত করা। এই নিয়ে বছরের পর বছর আমি

পরীক্ষা করে চলেছি। একদিন আমার সাধনা সফল হল। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারলাম।

মানুষ তৈরি করলাম বটে, কিন্তু প্রাণ পেয়ে সে হল দানব। একদিন সে ডক্টর নীল আর বেয়ারাকে হত্যা করে ওখান থেকে পালাল। তারপর যেখানে যত পৈশাচিক খুন হয়েছে, সব ওই দৈত্যের কাজ। উইলিয়মকে হত্যা করেছে ও, আর কাল এসে আমাদের বাড়ির সকলকে খুন করে গেছে। আমি আর একটু আগেও তাকে দেখেছি। তাই বলছি বন্ধু, জনকতক লোক জোগাড় করো, সশস্ত্র হয়ে চলো—আমরা ওকে হত্যা করব। নয়তো পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না।

ক্লেরভাল বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে। কথাগুলো যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তাঁরা দুজনেই দেখলেন জানলার কাছে এক কদাকার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক নিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ওইদিকে ছুটে গেলেন।

বন্ধুকে ওভাবে অনিশ্চিত আতঙ্কের মধ্যে ছুটে যেতে দেখে ক্লেরভালও তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে থানা থেকে নিলেন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ এবং কয়েকটি কুকুর। তারপর ছুটে চললেন বন্ধুর উদ্দেশে।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখলেন, তাঁর বন্ধু উত্তেজনায় শ্রান্তিতে ও ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে টলতে টলতে ছুটে চলেছেন সেই বিকটাকার দানবের পিছনে। কতবার তাঁর দেহ অবসন্ন তুহিন বরফের উপর পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি স্থির হতে পারছেন না। পরক্ষণেই উঠে ছুটে যাচ্ছেন গলা বরফের উপর দানবের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে।

ক্লেরভাল একবার গুলি ছুড়ে বন্ধুকে জানাতে চাইলেন যে তিনি তাঁর সাহায্যে এসেছেন। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন শুনতে পারলেন কি না বোঝা গেল না। শীতে ও ভয়ে অবসন্ন হাত থেকে কখন তাঁর বন্দুক পড়ে গেছে, কাঁটাগাছে বিঁধে জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে তবু দানবটিকে একবার শিক্ষা দেওয়ার নেশায় ছুটে চলেছেন তিনি।

কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনো জ্ঞানও নেই—শুধু সেই পিশাচটিকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছেন তিনি। বরফ-ঢাকা বিরাট পাহাড় অতি সহজে পার হয়ে যাচ্ছে দানবটি, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনও মরিয়ার মতো সেই দুরধিগম্য পাহাড় সমানতালে ডিঙিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সমস্ত দেহে যেন এক অমানুষিক শক্তি ভর করেছে। সুস্থ দেহে ও মনে যে ঝুঁকি নেওয়া যায় না, যে পাথর লাফিয়ে যাওয়া যায় না, যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যায় না—সেই দৈত্যকে ধরার জন্য তা সবই অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছেন। পুলিশের দলবল নিয়ে ক্লেরভাল তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

হঠাৎ ক্লেরভাল সভয়ে শিউরে উঠলেন। একজায়গায় বরফ গলে জল হয়ে গেছে। ছোট ছোট বরফের টুকরোয় সেই জলের স্রোত আরো ভীষণ বেড়ে গেছে।

দানবটি অতি সহজেই সেই জলাটি পার হয়ে চলে গেল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন উন্মাদের মতো সেই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর কিছুক্ষণ আর কিছু দেখা গেল না। একটু পরে ক্লেরভাল দেখলেন যে, দানবটি তাঁকে ধরে তুলে নিজের কাছে নিয়ে এল।

ক্লেরভাল এবার তাঁর দলবল নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে খানিকটা ঘুরে সেইখানে এলেন। ভীত-বিহ্বল হয়ে দেখেন তাঁর মৃত বন্ধু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নিঃসাড় দেহ একটা পাথরের উপর শোয়ানো আর এক বিরাট দৈত্য ঝুঁকে পড়ে ছলছল কণ্ঠে বলছে : হে আমার স্রষ্টা, আমি এ কী করলাম ! আমিই তোমাকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চাইনি, তবু তুমি আমারই জন্য মারা গেলে। আমি শুধু তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছি যেমন তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ। তবু তোমার—আমার স্রষ্টার—হত্যাকারী আমি, আমার এ পাপের স্খালন নেই। হে ভগবান, তোমার মৃত্যুতেই আমার সমস্ত অভিমানের অবসান হল। তোমাকে একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের অনুভূতি দিতে পেরেছি, আমার আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। আমিও শিগগিরই তোমার সঙ্গে মিলিত হব। সারাজীবন আমি একাকী সঙ্গীহীন ছিলাম, মৃত্যুও হবে সঙ্গীহীন। কোনো এক উত্তরমেরু-দেশে নিজের চিতা নিজে প্রস্তুত করে আমার এই ঘৃণিত জীবন আহুতি দেব। আর-একবার এই সুন্দর পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে শেষ দেখা দিয়ে যাব আমার জন্মস্থান, তোমার অক্লান্ত কর্মের পীঠস্থানকে, তারপর সব শেষ! বিদায় স্রষ্টা—বিদায়।

দানবটি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়েই দেখল বিস্মিত ক্লেরভালকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একলাফে অনেকদূর চলে গেল। ক্লেরভালও তাঁর বন্দুক তুলে গুলি ছুড়লেন। হয়তো সে আহত হল, এক আর্তনাদও শোনা গেল—আঁ আঁ আঁ...

স্রষ্টার শোকে হয়তো সে আবার তার ভাষা হারিয়েছে, আবার পেয়েছে সে তার জন্মক্ষণের ভাষা।

পুলিশবাহিনী তাদের কুকুর নিয়ে এগিয়ে চলল। ক্লেরভাল বললেন—আমরা ল্যাবরেটরির দিকে যাব। দানবটি নিশ্চয় সেখানেই যাবে। আমি শুনেছি তার কথা।

কিছুক্ষণ পর আর সেই দৈত্যটিকে দেখা গেল না। সকলে অবাক হয়ে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল কাছের একটি পাহাড় থেকে সে নেমেই দুটো কুকুরকে নিয়ে অন্তর্ধান হল। ব্যাপারটা এত আকস্মিক ঘটল যে তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে কুকুরদুটোর মৃত্যু-আর্তনাদ শোনা গেল।

কিন্তু পরাজয় স্বীকার করলে চলবে না। পুলিশবাহিনী তার পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে, সবার আগে ক্লেরভাল। কুকুরগুলো চারদিক থেকে চিৎকার করতে করতে তাড়া করেছে। একবার সেই দৈত্যকে দেখা যায়, আবার সে হারিয়ে

যায়। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ—একটা আর্তনাদ। আবার হয়তো দু-একটি কুকুরের মৃত্যু-আর্তনাদ শোনা যায়। কোথাও-বা দু-একটি পুলিশের মৃতদেহও গড়িয়ে পড়ে। তবু থামা নয়, পুলিশবাহিনী এই হত্যাকারীকে ধরবার অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে চলে।

এক ঝলক কুয়াশায় সমস্ত পৃথিবী ঢাকা পড়ে গেল। সামনে-পেছনে কিছুই দেখা যায় না। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল সেই শয়তান।

একটু পরে কুয়াশা কেটে গেলে তাকে দেখা গেল আর একটি উঁচু পাহাড় বেয়ে সে উঠছে; উঠছে সে ঊর্ধ্বমুখী পাইন, চেরি, দেওদারের সারি ছাড়িয়ে তুষারাবৃত সরু পাহাড়ি পথ বেয়ে উঁচুতে—আরো উঁচুতে, আর পিছনের নৃশংস অনুসরণকারীদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে। এই হয়েছে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের সাহস। তাকে ধরবার জন্য মানুষের কী আপ্রাণ চেষ্টা! কত লোক, কত কুকুর, কত বন্দুক, কত গুলি! তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এইভাবে এত লোকের সঙ্গে সে একা যুদ্ধ করবে কী করে? এক-একজন আসুক—আপত্তি নেই। সে দেখিয়ে দেবে মানুষের চেয়েও সে শ্রেষ্ঠতর—মানুষের চেয়েও তার স্থান উচ্চে।

তাকে লক্ষ্য করে কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে ছুটছে। মুহুর্মুহু গুলিও ছোড়া হচ্ছে। তাকে একমুহূর্ত আর চোখের আড়াল করা হচ্ছে না। যেমনভাবেই হোক আজ এই বিরাট দানবটির সঙ্গে শেষ খেলা খেলে যেতে হবে।

এতক্ষণে সে ল্যাবরেটরির কাছে এসে পড়েছিল। ক্লেরভাল বললেন—ওকে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দিও না। একবার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আর কেউ ওকে ধরতে পারবে না, অথচ আমরা সকলেই প্রাণ হারাব।

সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশরা হাত-বোমা ছুড়ে মারল। হাত-বোমা কিন্তু কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তারপর একবার প্রবল বিস্ফোরণে ল্যাবরেটরিতে উঠবার সিঁড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ল্যাবরেটরিতে ওঠার আর কোনো উপায় রইল না।

দানবটি দারুণ আক্রোশে তখন চিৎকার করে উঠল—আঁ আঁ আঁ...

তারপর সে পিছনদিকের খাড়া পাহাড় বেয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে উপরে উঠতে লাগল। যেন ওই ল্যাবরেটরির মধ্যে নিহিত আছে তার যথাসর্বস্ব—তার জীবন-প্রদীপ।

দানবটি ল্যাবরেটরির ছাদের কাছাকাছি পৌঁছুতেই নিচ থেকে বন্দুক গর্জে উঠল—দুড়ুম...দুড়ুম...দুড়ুম...

দুটি গুলি তার পিঠে লাগল। কিন্তু তবু সে তার সংকল্প হারাল না। হিংসায় বিদ্বেষে রুক্ষ হয়ে সে আরো তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরিতে উঠতে লাগল। আজ তাকে চূর্ণ করে, ধ্বংস করে, লাল আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত আকাশ ভরিয়ে দিয়ে তার ঘৃণিত জীবনের ওপর শত শত অত্যাচারের প্রতিফল দিয়ে সে বিদায় নেবে।

আবার গুলি ছুটল। সে কোনো রকমে ছাদের কার্নিশের উপর এল। পুলিশের গুলি অবিশ্রান্ত তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। কতগুলো যে তার গায়ে লাগছে, বোঝা যাচ্ছে না—সে শুধু ভাষাহীন অমানুষিক চিৎকার করছে এই অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে।

তারপর সে আর পারল না, পারল না আর সশস্ত্র সভ্য মানুষের সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে একা নিরস্ত্র যুদ্ধ করতে—রক্তাক্ত দেহে সে কার্নিশের উপর শুয়ে পড়ল। একবার সে তার হাত তুলতে চেষ্টা করল—একবার অনুসরণকারী ক্রুদ্ধ জনতার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। দু-একবার তার অসাড় ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। তারপর শেষবারের মতো সে তার বিধাতার কাছে এই অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে চোখ বুজল।

তখন ভোরের আকাশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে।



চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র